আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে হাসিনার পতন ও পলায়ন

আলফাজ আনাম

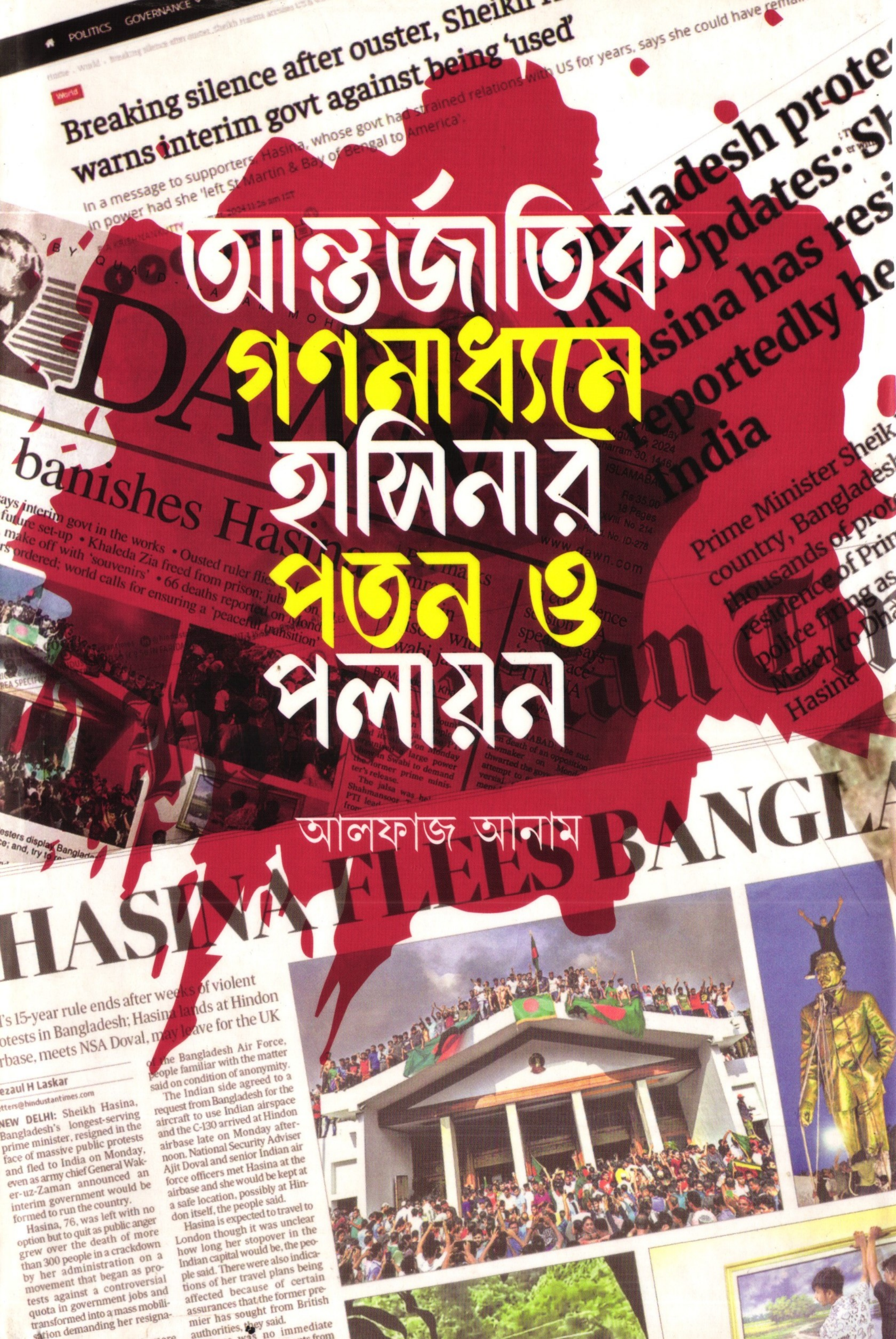

আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে হাসিনার পতন ও পলায়ন

আলফাজ আনাম

স্বত্ব	আলফাজ আনাম
প্রচ্ছদ	আবুল ফাতাহ মুন্না
বানান সমন্বয়	আবদুল্লাহ আরাফাত, মুনতাসির বিল্লাহ
মুদ্রণ	একতা প্রিন্টিং প্রেস
প্রকাশনাক্রম	৯৯

আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে হাসিনার পতন ও পলায়ন

আলফাজ আনাম

প্রচ্ছদ প্রকাশন

আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে
হাসিনার পতন ও পলায়ন

আলফাজ আনাম

প্রচ্ছদ প্রকাশন
৩৪, নর্থব্রুক হল রোড, মাদরাসা মার্কেট (২য় তলা)
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
০১৩১৫-৩৭৩০২৫, ০১৭২৪-৫৩৮৫৯০
www.prossodprokashon.com

১ম প্রকাশ : একুশে বইমেলা, ২০২৫

মূল্য : ৩০০/- (তিনশত টাকা)

ভূমিকা

শেখ হাসিনার দেড় দশকের স্বৈরাচারী শাসনের অবসান ঘটেছে একটি সফল গণ-অভ্যুত্থানের মাধ্যমে। গণ-আন্দোলনের মুখে তিনি দেশ ছেড়ে পালিয়ে আশ্রয় নেন প্রতিবেশী দেশ ভারতে। বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে সবচেয়ে রক্তাক্ত এই অভ্যুত্থানে মারা গেছেন দেড় হাজারের বেশি মানুষ। আহত হয়েছে বিশ হাজারেরও বেশি। শেখ হাসিনার পিতা শেখ মুজিবুর রহমানও ছিলেন একজন একনায়কত্ববাদী স্বৈরশাসক। তিনি নিহত হয়েছিলেন সামরিক অভ্যুত্থানে।

শেখ হাসিনা তার দেড় দশকের শাসনামলে তার পিতার নীতি অনুসরণ করেছেন। অনেক ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন তার পিতার চেয়েও নির্মম। নিজের ক্ষমতাকে দীর্ঘস্থায়ী করতে শেখ হাসিনা সব ধরনের পন্থাই অবলম্বন করেছেন। হাজারের বেশি মানুষকে গুম, হাজার হাজার বিরোধী রাজনৈতিক নেতাকর্মীকে হত্যা ও কারাগারে আটকে রেখে তিনি টানা পনেরো বছর ক্ষমতার মসনদে আসীন ছিলেন।

তার শাসনামলে তিনটি জাতীয় নির্বাচন হয়েছিল, যেখানে বিরোধী দলের কোনো অংশগ্রহণ ছিল না। বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় কিংবা ডামি প্রার্থী দিয়ে নিজের দলের বিজয় নিশ্চিত করেছিলেন। পিতার মতো তিনি ক্ষমতায় থাকার জন্য ছিলেন পুরোপুরিভাবে ভারতের ওপর নির্ভরশীল। কিন্তু ভারতের সাহায্য নিয়ে তিনি শেষ পর্যন্ত টিকে থাকতে পারেননি। তবে তিনি ভারতে আশ্রয় পেয়েছেন। বিরোধীদল, ভিন্নমতাবলম্বী ও সরকারের সমালোচকদের ওপর দমন-পীড়ন ছিল শেখ হাসিনা সরকারের কাছে একটি অতি সাধারণ বিষয়।

শেখ হাসিনার পতন হয়েছে ছাত্র-জনতার অভূতপূর্ব এক গণ-অভ্যুত্থানে। বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো দেড় দশক ধরে তাকে হটানোর চেষ্টা করে যখন সফল হতে পারেনি, তখন অরাজনৈতিক একটি আন্দোলন থেকে শেখ হাসিনার পতন হয়।

বাংলাদেশে সরকারি চাকরিতে কোটাব্যবস্থা বাতিলের দাবিতে শুরু হওয়া ছাত্র আন্দোলন এক অবিস্মরণীয় গণ-অভ্যুত্থানে পরিণত হয়। শেষ পর্যন্ত সহস্রাধিক মানুষের তাজা প্রাণ ও রক্তের বিনিময়ে শেখ হাসিনার স্বৈরশাসনের কবল থেকে মুক্ত হয়েছে বাংলাদেশ।

হাসিনা সরকারের ব্যাপক গণবিরোধী কর্মকাণ্ড জনমনে যে বিক্ষোভের আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছিল, তার প্রতিফলন ঘটেছে জুলাইয়ে ছাত্র-জনতার আন্দোলনে। আন্দোলন যখন তুঙ্গে, তখন কোটা নিয়ে শেখ হাসিনার একটি মন্তব্যকে কেন্দ্র করে শিক্ষার্থীরা আরও ক্ষুব্ধ হন এবং সরকার পতনের একদফা দাবিতে নতুন কর্মসূচি ঘোষণা করেন। এই কর্মসূচিতে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে জনতার ঢল নামে, যা একসময় সরকার পতনের একদফা আন্দোলনে রূপ নেয়। সরকারও আন্দোলন দমনে কঠোর অবস্থান নেয়। ফলে শুরু হয় ব্যাপক হত্যাযজ্ঞ। আন্দোলনকারীদের ওপর নিরাপত্তা বাহিনী ও সরকার সমর্থকদের নির্বিচার গুলিতে নিহত হয়েছে হাজারো মানুষ।

এরপরও আন্দোলনকারীরা পিছু না হটলে শেখ হাসিনা সেনাবাহিনীর সাহায্য চান। কিন্তু সেনাবাহিনী আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে অস্বীকৃতি জানিয়ে শেখ হাসিনার সরকারের ওপর থেকে সমর্থন প্রত্যাহার করে। কার্যত এর পরই জনতার বাঁধভাঙা জোয়ারে ভেসে যায় শেখ হাসিনার সরকার। দ্রুত ক্ষমতা ছেড়ে তিনি ভারতে পালিয়ে যান। শেষ পর্যন্ত অবসান ঘটে শেখ হাসিনার দীর্ঘ স্বৈরশাসনের।

সরকারি চাকরির কোটাবিরোধী আন্দোলন যখন শেখ হাসিনা সরকার নির্মমভাবে দমনের চেষ্টা করেন, তখন থেকে এই আন্দোলন আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমের নজরে আসে। নিউইয়র্ক টাইমস, আল-জাজিরা, বিবিসি ও সিএনএন নিয়মিত এই আন্দোলনের খবর প্রচার শুরু করে। তবে ছত্রিশ দিনের আন্দোলনে দেড় দশকের নিষ্ঠুর একটি সরকারের পতনে ঘটবে, তা ছিল অবিশ্বাস্য। ফলে শেখ হাসিনার পতনের দিন থেকে আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে নানা ধরনের বিশ্লেষণ প্রকাশিত হতে থাকে।

বিদেশি গণমাধ্যমে প্রকাশিত এসব প্রতিবেদনে শেখ হাসিনার পতন ও পলায়নের আগের ও পরের নানা ঘটনা উঠে আসে। সেখানে শেখ হাসিনার দেড় দশকের শাসনের চিত্র উঠে আসে, যার ঐতিহাসিক গুরুত্ব অপরিসীম।

এই দিকটি বিবেচনা করে বিদেশি বিভিন্ন গণমাধ্যমে প্রকাশিত খবর ও বিশ্লেষণগুলো মলাটবদ্ধ করার উদ্যোগ নিই। কিছুটা দ্রুততার সাথে বইটি প্রকাশ করতে হয়েছে। ফলে বানান ও মুদ্রন বিভ্রাট থেকে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। পরবর্তী সংস্করণে সেগুলো সংশোধন করার আশা করি। বইটি প্রকাশের উদ্যোগ নেওয়ার জন্য প্রচ্ছদ প্রকাশনকে ধন্যবাদ।

আলফাজ আনাম
১১৫, নাভানা বানু গার্ডেন
কাজী অফিস লেন,
বড় মগবাজার, ঢাকা।

সূচিপত্র

সরকারবিরোধী বিক্ষোভের মুখে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর পদত্যাগ...... ১১

ঘৃণিত স্বৈরাচার শেখ হাসিনার শেষ কয়েক ঘণ্টা ১৫

হাসিনার পদত্যাগ ২১

বাংলাদেশের ছাত্র আন্দোলনের বিজয় অবাক করা ঘটনা নয়............ ২৫

নোবেলজয়ীকে নতুন সরকারের উপদেষ্টা হিসেবে দেখতে চান
বাংলাদেশের বিক্ষোভকারীরা ৩১

শেখ হাসিনা : একটি ভুল এবং ১৫ বছরের শাসনের অবসান ৩৫

আমরা এই সরকারের পতন ঘটিয়েছি, প্রয়োজনে আবার ঘটাব......... ৪১

বাংলাদেশের লৌহমানবীর পতন... ৪৫

বাংলাদেশ : একটি রাজবংশের পতন ৫৩

বাংলাদেশে সাম্প্রতিক বিক্ষোভের ওপর প্রাথমিক বিশ্লেষণ ৫৭

ভারতের বিনিয়োগ ছিল হাসিনায়; বাংলাদেশে নয় ৭৭

বাংলাদেশে প্রধানমন্ত্রীর পতনের পর
দেশের শাসন পদ্ধতির খোঁজে জেন-জি ৮৯

বাংলাদেশে ক্ষমতাসীন ও আন্দোলনকারীদের সামনে কঠিন পথ ৯৩

পুলিশের বিরুদ্ধে বিক্ষোভকারী যখন বাংলাদেশের ট্যাংকম্যান ৯৯

বাংলাদেশের লৌহমানবী শেখ হাসিনার পতন ১০৫

বাংলাদেশের বিক্ষোভের নেপথ্যে গভীর হতাশা ১১১

বিস্ফোরণে উন্মুখ ছিল বাংলাদেশ, আমি ছিলাম ছাত্রদের সঙ্গে ১১৭

হাসিনার পতনের পর এখন সবকিছুই খুব ভালো......................... ১২৩

বাংলাদেশের ক্ষমতাচ্যুত নেতা হাসিনাকে সহায়তা :
বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে ভারত ১২৭

আন্দোলনকারীদের সমর্থনে সেনাপ্রধানকে রাজি করান
বাংলাদেশের তরুণ সেনা কর্মকর্তারা ১৩১

মুহাম্মদ ইউনূস, নোবেল লরিয়েটের কাঁধে
বাংলাদেশকে রক্ষার দায়িত্ব ১৩৭

শেখ হাসিনা : ভারতের দুর্বহ ভার ১৪১

কেন হাসিনা পালাতে বাধ্য হলেন ১৪৭

বাংলাদেশের স্বৈরশাসকের পলায়ন : ক্ষমতার শীর্ষে ভয়ংকর শূন্যতা..... ১৫৩

সেনা ও গণ-অভ্যুত্থানের চাপে বাংলাদেশের
প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পদত্যাগ ১৫৭

সরকারবিরোধী বিক্ষোভের মুখে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর পদত্যাগ

CNN

(*সিএনএন*-এর জন্য *বাংলাদেশ প্রাইম মিনিস্টার রিজাইনস অ্যাজ ডেডলি অ্যান্টি গভর্নমেন্ট র‍্যালিস গ্রিপ দ্য নেশন* শিরোনামে প্রতিবেদনটি লেখেন আইজ্যাক য়ি ও তাবিরুল মিরাজ রিপন। প্রকাশ করা হয় ৫ আগস্ট, ২০২৪ তারিখে।)

দক্ষিণ এশিয়ান রাষ্ট্র বাংলাদেশে কয়েক সপ্তাহ ধরে তীব্র বিক্ষোভ চলার পর পদত্যাগ করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। ঘোষণাটি আসে দেশটির সেনাপ্রধান জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামানের মারফতে। এর আগেই রাজধানী ঢাকায় প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনে ঢুকে পড়ে বিক্ষোভকারীরা।

ছবিতে দেখা যায়, হাসিনার বাসভবনের কাছে বহু গাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়েছে। আশপাশের এলাকাগুলো থেকে ছুটে আসা লোকজনের ঢল নিয়ন্ত্রণ করতে ব্যর্থ হয় পুলিশ।

ঢাকায় সিএনএনের হয়ে কর্মরত এক সাংবাদিকের কাছ থেকে পাওয়া তথ্য থেকে জানা যায়, সকালে ওই এলাকায় বিক্ষোভ করতে আসা লোকজনের ওপর চড়াও হয়েছিল পুলিশ ও সেনাসদস্যরা।

এর আগে রবিবার পুলিশ ও বিক্ষোভকারীদের মধ্যে সংঘর্ষে ৯১ জন নিহত এবং কয়েকশ মানুষ আহত হয়। সরকারি চাকরিতে কোটাব্যবস্থা বাতিল এবং প্রধানমন্ত্রীর পদত্যাগের দাবিতে বাংলাদেশে কয়েক সপ্তাহ ধরে বিক্ষোভ চলছে। বিরোধীদের দাবি, সরকারি চাকরিতে যে কোটাব্যবস্থা রয়েছে, তা বৈষম্যমূলক।

সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশের ইতিহাসে একদিনে এত মানুষের হতাহতের ঘটনা আর ঘটেনি। রবিবার নিহতদের মধ্যে ১৩ জন পুলিশও রয়েছেন।

বার্তাসংস্থা *রয়টার্স*-এর প্রতিবেদনে বলা হয়—'জুলাইয়ের ১৯ তারিখ একদিনে ৬৭ জন নিহত হয়।' রবিবারের নিহতের সংখ্যা ১৯ জুলাইকেও ছাড়িয়ে গেছে। ওই সময় বিক্ষোভকারী শিক্ষার্থীরা শুধু কোটাব্যবস্থা বিলোপের দাবিতে রাস্তায় নামে। শুক্রবার প্রকাশিত ইউনিসেফের এক প্রতিবেদনে বলা হয়—'বিক্ষোভ চলাকালে গত মাসে অন্তত ৩২ জন শিশু নিহত হয়েছে।'

অন্যান্য শহরের মধ্যে রাজশাহী, বরিশাল ও চট্টগ্রামেও তীব্র অসন্তোষ দেখা গেছে, যা সপ্তাহান্তে সরকারকে অনির্দিষ্টকালের জন্য সারা দেশে কারফিউ জারি করতে বাধ্য করে। মানবাধিকার সংস্থাগুলো অভিযোগ করেছে, সরকার বিক্ষোভকারীদের ওপর অতিরিক্ত শক্তিপ্রয়োগ করছে, যদিও সরকার এ অভিযোগ অস্বীকার করে।

সেনাপ্রধান জানান—'হাসিনার পদত্যাগের পর এখন সেনাবাহিনী একটি অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠন করবে।' তিনি শিক্ষার্থীদের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেন—'শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষা করতে আমাদের সহযোগিতা করুন।'

সোমবার দেওয়া ভাষণে জামান আরও বলেন—'আপনাদের যেসব দাবি রয়েছে, তার সবই আমরা পূরণ করব। দেশের শান্তি ফিরিয়ে আনা নিশ্চিত করা হবে। এ ব্যাপারে আপনাদের সহযোগিতা চাই। আপনাদের প্রতি আমাদের অনুরোধ, সহিংসতা থেকে দূরে থাকুন। সেনাবাহিনী কারও ওপর গুলি চালাবে না। পুলিশ কারও ওপর গুলি চালাবে না। আমি তাদের প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দিয়েছি।'

বিক্ষোভকারীদের নির্দয়ভাবে পিটিয়েছে পুলিশ

সিএনএনের সঙ্গে কাজ করছেন এমন একজন সাংবাদিক জানান, ঢাকায় দিনের শুরুতে বিক্ষোভকারীদের ওপর গুলি ছুড়ে পুলিশ। নিরাপত্তা বাহিনীর বিরুদ্ধে বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে নৃশংস আচরণের অভিযোগ উঠেছে আগেই।

ওই সাংবাদিক আরও জানান, সকালে ঢাকা মেডিকেল কলেজের সামনে বিক্ষোভকারীরা জড়ো হলে পুলিশের গুলিতে কমপক্ষে চারজন আহত হয়। তাদের মধ্যে অন্তত একজনের মাথায় গুলি লাগে।

বিক্ষোভকারীরা সিএনএনকে জানান, সেনাসদস্যরা ঢাকা মেডিকেল কলেজের বকশিবাজার ফটক বন্ধ করে দেয়। পুলিশও বিক্ষোভকারীদের ওপর কাঁদানে গ্যাস ব্যবহার করে।

রাজধানীর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস এবং শহীদ মিনারে শিক্ষার্থীরা জড়ো হলে সেখানেও পুলিশি নির্যাতনের শিকার হয়।

বিক্ষোভকারীরা বলেন, পুলিশ লাঠি দিয়ে বেদম পিটুনি দিয়ে এবং কাঁদানে গ্যাস ব্যবহার করে শিক্ষার্থীদের ছত্রভঙ্গ করার চেষ্টা চালায়।

এক বিক্ষোভকারী সিএনএনকে বলেন—'১৫ মিনিট আগে শাহবাগে পুলিশ সরাসরি গুলি ছুড়তে শুরু করে। ওখানে কতজন আহত হয়েছে আমরা জানি না। গুলি এখনও চলছে। মতিঝিল ও শান্তিনগরের কাছে সাধারণ মানুষের ওপর কাঁদানে গ্যাস ছোড়া হয়েছে।'

ঢাকার অন্যত্র সেনাসদস্যরা আকাশের দিকে ফাঁকা গুলি ছুড়েছে। বিক্ষোভকারীদের দিকে লক্ষ্য করেও তারা গুলি চালায়।

বৈশ্বিক ইন্টারনেট নজরদারি প্রতিষ্ঠান নেটব্লক জানিয়েছে, বাংলাদেশে ইন্টারনেট পরিষেবা প্রায় বন্ধ। এর আগে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ও মোবাইল ফোনের ইন্টারনেট পুরোপুরি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। এই পরিস্থিতির মধ্যেই বাংলাদেশ থেকে বিস্তারিত সংবাদ ও ভিডিও পাঠানো হয়েছে।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে পোস্ট করা এবং সিএনএনের ভেরিফাই করা ভিডিওতে দেখা যায়, ঢাকার এন-ওয়ান মহাসড়কে নিরাপত্তা বাহিনী বিক্ষোভকারীদের কাছাকাছি এলাকায় আকাশের দিকে গুলি ছুড়ছে।

ঢাকার বিক্ষোভকারীরা সিএনএনকে জানান, বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস ঘিরে রেখেছে সেনাবাহিনী।

নিলক্ষেত, কাঁটাবন ও শাহবাগ এলাকা আক্ষরিক অর্থেই অবরুদ্ধ। ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটেলের সামনে অবস্থান নিয়েছে সেনাবাহিনীর সাঁজোয়া যান। তারা শুধু চিকিৎসকদের ভেতরে যেতে দিচ্ছেন।

ঘৃণিত স্বৈরাচার শেখ হাসিনার শেষ কয়েক ঘণ্টা

BBC

(*বিবিসি*-তে এই নিবন্ধ প্রকাশিত হয় ৬ আগস্ট। শিরোনাম ছিল *শেখ হাসিনা'স ফাইনাল আওয়ার্স অ্যাজ এ হেটেড অটোক্র্যাট*। আনবারাসান ইথিরাজন ও আকবর হোসেইন নিবন্ধটি লেখেন।)

বাংলাদেশের ক্রমবর্ধমান অসন্তোষ দমনে রবিবার শেখ হাসিনা যখন তার নিরাপত্তা বাহিনীর সঙ্গে আলোচনায় বসেন, সম্ভবত তখনও প্রধানমন্ত্রী হিসেবে তার সময় যে ফুরিয়ে এসেছে—এ কথাটি বিশ্বাস করতেন না তিনি।

এর কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই তিনি ক্ষমতা ছাড়তে বাধ্য হন। গদি ছাড়েন জনতার ক্ষমতার কাছে পরাভূত হয়ে। বাস্তবতা হচ্ছে, তার পদত্যাগ ও পালিয়ে যাওয়া এত দ্রুততম সময়ে সম্পন্ন হয়েছে যে, খুব কম মানুষই তা আগে থেকে আঁচ করতে পেরেছিল।

বিবিসিকে হাসিনার ছেলে বলেন—'শীর্ষ নিরাপত্তা কর্মকর্তা নয়; বরং পরিবারের সদস্যদের পরামর্শেই পালানোর সিদ্ধান্ত নেন হাসিনা।'

একদম সঠিক সময় হাসিনা এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেন। তার পালিয়ে যাওয়ার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই বিক্ষুব্ধ জনতা তার বাসভবনে ঢুকে পড়ে।

রবিবার সকালে জাতীয় নিরাপত্তা কমিটির বৈঠক ডাকা হয়। এ কমিটিতে ছিলেন তিন বাহিনী প্রধান, জ্যেষ্ঠ নিরাপত্তা কর্মকর্তাবৃন্দ ও পুলিশ। বেশ শান্তভাবেই এই বৈঠক সম্পন্ন হয়। দেশজুড়ে কয়েক সপ্তাহ ধরেই সরকারবিরোধী বিক্ষোভ চলছিল। এতে ক্রমেই চাপ বাড়ছিল প্রধানমন্ত্রীর ওপর। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর সবচেয়ে ভয়াবহ সহিংস বিক্ষোভ ছিল এটি। এতে কয়েকশ মানুষ নিহত হয়েছে। শুধু রবিবারই অন্তত ৯০ জন নিহত হয়। এদের বেশিরভাগেরই মৃত্যু হয় নিরাপত্তা বাহিনীর গুলিতে। তবে বেশ কয়েকজন পুলিশও বিক্ষোভকারীদের হামলায় নিহত হয়।

বিবিসি বাংলা-র হাতে আসা তথ্যমতে, শেখ হাসিনা তার হাতে দুটো অপশন খোলা রাখতে চেয়েছেন। শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত বলপ্রয়োগ করে ক্ষমতায় টিকে থাকার চেষ্টা করা অথবা দেশ ছেড়ে চলে যাওয়া।

তবে সেনাবাহিনীর কর্মকর্তারা হতাহতের সংখ্যা আর বাড়াতে চাননি। রবিবার দেশের বিভিন্ন জায়গায় সাধারণ মানুষ ও বিক্ষোভকারীরা সেনাবাহিনীর মাঠপর্যায়ের সৈনিক ও কর্মকর্তাদের সঙ্গে মিশে গিয়েছিল। সে পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে সেনাবাহিনীর ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা বুঝতে পারেন, পরিস্থিতি ক্ষমতাসীনদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেছে।

বিবিসিকে কয়েকটি সূত্র জানায়, ওই বৈঠকে আলাদাভাবে সশস্ত্রবাহিনীর শীর্ষ কর্মকর্তারা প্রধানমন্ত্রীকে জানান, সেনাসদস্যরা বেসামরিক জনগণের ওপর গুলি চালাতে পারে না। তবে পুলিশের নিরাপত্তা রক্ষায় তারা কাজ করতে পারবে। পরে আরও জানা যায়, পুলিশ কর্মকর্তারা ওই সময় গোলাবারুদ ফুরিয়ে আসছে বলে অভিযোগ করেন।

অবসরপ্রাপ্ত ব্রিগেডিয়ার জেনারেল এম সাখাওয়াত হোসেন বিবিসিকে বলেন— 'পুলিশ ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। আমরা শুনেছি তাদের কাছে পর্যাপ্ত গোলাবারুদও ছিল না।'

শেখ হাসিনা সেনাবাহিনী ও নিরাপত্তা কর্মকর্তাদের সেসব কথায় কান দেননি। মুখের ওপর তার সঙ্গে দ্বিমত করার সাহসও কারও ছিল না। ওই বৈঠকের পর শেখ হাসিনা আরও কঠোর বার্তা দেন। তিনি বিক্ষোভকারীদের 'সন্ত্রাসী' হিসেবে অভিহিত করেন। তিনি সাধারণ মানুষের প্রতি 'অগ্নিসন্ত্রাসীদের' প্রতিহত করার আহ্বান জানান। হাসিনার এই ঘোষণার ফলে নিরাপত্তা বাহিনীর মধ্যে আশঙ্কা তৈরি হয়, তারা খুব সম্ভবত একটি গৃহযুদ্ধের দিকে এগিয়ে চলেছে।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে রবিবারের সহিংসতার ছবি ভাইরাল হয়ে যায়। নিহতের সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বাড়ছিল। পুলিশ ও আওয়ামী লীগের ছাত্রসংগঠনের গুলিতে আহত এক তরুণের ছবি ক্ষোভের আগুনে ঘি ঢেলে দেয়। সহিংসতার ভয়াবহতা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ছাত্রনেতারা ঢাকামুখী একটি গণমার্চের সময় একদিন এগিয়ে আনে। সরকারের জন্য এটি ছিল একটি বড়ো আঘাত।

গোয়েন্দা তথ্যে জানানো হয়, শিক্ষার্থীদের দাবিগুলোর পক্ষে গণজোয়ারের সৃষ্টি হয়েছে। হাজারো মানুষ তার পরের দিন রাজধানীতে ঢোকার পরিকল্পনা করছে। নিরাপত্তা বাহিনী যদি এই বিক্ষোভকারীদের আটকানোর চেষ্টা করে, তাহলে সেখানে রক্তের স্রোত বয়ে যাবে। এ পরিস্থিতিতে সেনাপ্রধান ওয়াকার-উজ-জামান আবারও প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলার সিদ্ধান্ত নেন।

বিশ্বস্ত সূত্রে জানা যায়, রবিবার সন্ধ্যায় তিন বাহিনী প্রধান শেখ হাসিনার সঙ্গে দেখা করেন। তারা হাসিনাকে জানান, পরিস্থিতি ক্রমেই আরও বেশি ঘোলাটে হয়ে উঠেছে। সোমবার সকালের মধ্যেই হাজার হাজার মানুষ ঢাকায় ঢুকে পড়বে। নিরাপত্তা বাহিনীর পক্ষে হাসিনার বাসভবনের সুরক্ষার নিশ্চয়তা দেওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু শেখ হাসিনা তখনও তাদের পরামর্শ গ্রহণ করেননি।

ঢাকার সাংবাদিকরা জানান, তারা বুঝতে পারছিলেন ক্ষমতার হাতবদল শুরু হয়ে গেছে। রবিবার রাতেই বেশ কিছু এলাকা থেকে পুলিশ সরে আসে। শহরজুড়ে যে নিরাপত্তা ব্যারিকেডগুলো দেওয়া হয়েছিল, তার বেশিরভাগই পুলিশশূন্য হতে শুরু করে।

জেনারেল হোসেন বলেন—'শেখ হাসিনা জেদ ধরে বসে ছিলেন। তিনি পদত্যাগ করতে চাননি। পালাতেও চাননি। বাস্তব পরিস্থিতি বোঝাতে তিন বাহিনী প্রধান তার কাছে যান এবং কথা বলেন।'

তিন বাহিনী প্রধান হাসিনাকে বলেন—'সেনাদের পক্ষে সাধারণ মানুষের ওপর গুলি চালানো কঠিন।'

তারা আরও বলেন—'সেনারাও এ দেশেরই একটি অংশ। তাদের বেশিরভাগই গ্রাম থেকে সেনাবাহিনীতে উঠে এসেছে। তারা তাদের নিজেদের মানুষের ওপর গুলি চালাবে না।'

সোমবার সকালে বিপুলসংখ্যক মানুষ ঢাকা অভিমুখে যাত্রা শুরু করে। জেনারেল জামান আবার হাসিনার বাসভবনে যান। আবারও পরিস্থিতির ভয়াবহতা ব্যাখ্যা করেন। তিনি হাসিনাকে জানান, মানুষ কারফিউ মানছে না। এরই মধ্যে সহিংসতা শুরু হয়ে গেছে।

বহু এলাকা থেকে পুলিশ প্রত্যাহার করা হয়েছে। হাসিনাকে জেনারেল জামান বলেন, তাদের পক্ষে আর খুব বেশি সময় প্রধানমন্ত্রীর সরকারি বাসভবন

গণভবনের সুরক্ষা নিশ্চিত করা সম্ভব নয়। খুব বেশি হলে আর এক ঘণ্টা হয়তো তারা নিরাপত্তা দিতে পারবেন।

এ পরিস্থিতিতে সশস্ত্র বাহিনীর প্রধানরা সিদ্ধান্ত নেন, প্রধানমন্ত্রীর পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে কথা বলার। অবশেষে পুলিশ ও সামরিক বাহিনীর প্রধানরা শেখ হাসিনাকে ক্ষমতা ছাড়তে রাজি করানোর জন্য তার বোন শেখ রেহানা সিদ্দিকের সঙ্গে আলোচনা করেন।

বাংলা ভাষার পত্রিকা প্রথম আলো জানায়—'তখন কর্মকর্তারা শেখ রেহানার সঙ্গে আরেক কক্ষে আলোচনা করেন। তাকে পরিস্থিতি জানিয়ে শেখ হাসিনাকে বোঝাতে অনুরোধ করেন। এরপর শেখ রেহানা বড়ো বোন শেখ হাসিনার সঙ্গে আলোচনা করেন। কিন্তু তিনি ক্ষমতা ধরে রাখতে অনড় থাকেন।'

হাসিনার ছেলে সজীব ওয়াজেদ জয় ও মেয়ে সায়মা ওয়াজেদ পুতুল বিদেশে থাকেন। একপর্যায়ে জয় ও পুতুল তাদের মায়ের সঙ্গে কথা বলেন। তারপর শেখ হাসিনা পদত্যাগে রাজি হন বলে পত্রিকাটি জানায়।

বিবিসিকে মঙ্গলবার সজীব ওয়াজেদ জয় বলেন—'আমার মা একেবারেই দেশ ছাড়তে চাননি। আমরা তাকে রাজি করিয়েছি।' তিনি আরও জানান, শনিবার সন্ধ্যা থেকেই তার মা পদত্যাগের কথা ভাবছিলেন।

জয় আরও বলেন—'আমরা পরিবারের সদস্যরা তাকে অনুরোধ করি পদত্যাগ করতে। আমরা তাকে বলি, এটা মব। তারা সহিংসতার জন্যই বের হয়েছে। তারা তোমাকে হত্যা করবে। আমরা তোমার নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে চাই। মবের ওখানে পৌঁছাতে যতটুকু সময় লাগে, এটুকু সময়ই তার হাতে ছিল। কোনো প্রস্তুতি ছাড়াই তারা বের হয়ে এসেছে।'

জয় বলেন—'আমি গতকাল তাকে দিল্লিতে ফোন করেছি। তার মনোবল এখনও চাঙ্গা। তবে তিনি খুবই হতাশ। বাংলাদেশের মানুষের আচরণ তাকে আহত করেছে।'

সূত্র জানায়, সোমবার সকালে শেখ হাসিনা দিল্লিতে সরকারি কর্মকর্তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে তাদের আশ্রয় দেওয়ার অনুরোধ করেন। ভারতও তাকে বাংলাদেশ থেকে পালিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দেন। ক্ষমতায় থাকার পুরো সময়টাই ভারতের কাছ থেকে প্রশ্নহীন প্রশ্রয় পেয়েছেন শেখ হাসিনা।

এর একদিন আগে ওয়াশিংটন ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের জানায়, শেখ হাসিনার সময় ফুরিয়ে এসেছে। তার সামনে আর খুব বেশি পথ খোলা নেই।

অবসরপ্রাপ্ত ব্রিগেডিয়ার জেনারেল সাখাওয়াত হোসেন বলেন—'সেনাবাহিনীর সমর্থন হারিয়েছেন—এ কথা বোঝার পর পদত্যাগ করেন শেখ হাসিনা। মানুষ কারফিউ ভাঙতে চাইছিল। তারা ঢাকায় হাসিনার বাসভবন অভিমুখে রওনা হওয়ার জন্য জড়ো হয়েছিল।'

তবে শেখ হাসিনা অনিচ্ছা নিয়ে পদত্যাগে রাজি হওয়ার পরও তার নিরাপদে দেশ ছাড়া নিয়ে প্রশ্ন ছিল। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক সামরিক বাহিনীর একজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা বিবিসি বাংলাকে বলেন, শেখ হাসিনা কখন পদত্যাগপত্রে স্বাক্ষর করেছেন এবং কখন হেলিকপ্টারে উঠেছেন সেটি কেবল জানতেন স্পেশাল সিকিউরিটি ফোর্স, প্রেসিডেন্ট গার্ড রেজিমেন্ট ও সেনাসদরের কয়েকজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা। পুরো বিষয়টি করা হয়েছিল বেশ গোপনে।

সকাল ৯টার দিকে দেশে ইন্টারনেট সংযোগ বন্ধ করে দেওয়া হয়। দেড় ঘণ্টার মতো নেট বন্ধ ছিল। শেখ হাসিনার গতিবিধি সম্পর্কে যেন কোনো খবরাখবর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে না পড়ে, সেজন্য এই ব্যবস্থা করা হয়। শেখ হাসিনা হেলিকপ্টারে ওঠার পর থেকে ইন্টারনেট সংযোগ সচল করা হয়।

ঊর্ধ্বতন সামরিক সূত্র জানায়, হাসিনাকে বিমানবন্দরে নিরাপদে পৌঁছে দেওয়ার জন্য ব্যবস্থা নেওয়া হয়। তার গাড়ির বহরে হামলা হতে পারে—এমন আশঙ্কা ছিলই। এ কারণে পুরো রাস্তায় নি—দ্র নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়। তবে শেষ পর্যন্ত তাকে সড়কপথে নিয়ে যাওয়াকে নিরাপদ মনে করা হয়নি। কাজেই তার জন্য হেলিকপ্টারের ব্যবস্থা করা হয়।

হাসিনার ছেলে জয় জানান—'শেষ পর্যন্ত শেখ হাসিনা পালাতে চাননি। তিনি চাচ্ছিলেন, আমার খালা চলে যাক। আমার মা হেলিকপ্টারে উঠতে চাচ্ছিলেন না। আমি তখন তার সঙ্গে ফোনে কথা বলছিলাম। আমি আমার মাকে রাজি করাই যে, খালাসহ তাকে অবশ্যই পালাতে হবে।'

তারা গণভবন ছেড়ে যাওয়ার পর বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর একটি সি-১৩০ হারকিউলিস এয়ারক্রাফট তাদের জন্য প্রস্তুত করা হয়।

সজীব ওয়াজেদ জয় বলেন, তার ধারণা তারা ভারতের পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্য ত্রিপুরার রাজধানী আগরতলায় যান। সেখান থেকে দিল্লিতে রওনা হন। এর আগেই ভারত তার এই রুটে ট্রানজিটের ব্যাপারে সম্মত হয়।

অন্য এক বিবরণ থেকে জানা যায়, তিনি প্রথমে হেলিকপ্টারে করে ঢাকার একটি বিমানবন্দরে যান। তারপর প্লেনে করে দিল্লির উদ্দেশে রওনা হন। তবে তিনি যে পথেই যান দুপুর দেড়টার সময় তিনি, তার বোন ও আওয়ামী লীগের নেতা সালমান ফজলুর রহমান দিল্লির উদ্দেশে হেলিকপ্টার থেকে এয়ারক্রাফটে ওঠেন।

সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া একটি ভিডিওতে দেখা যায়, চার বা পাঁচটি স্যুটকেস হেলিকপ্টারের সামনে রাখা। তবে ব্যবহার্য বেশিরভাগ জিনিস তিনি রেখে যেতে বাধ্য হয়েছেন, যেগুলো পরে গণভবনে ঢুকে বিক্ষুব্ধ জনতা হস্তগত করে বা নষ্ট করে। ওই সময়ও শেখ হাসিনা সম্ভবত আকাশপথেই ছিলেন।

কয়েক ঘণ্টা পর দিল্লিতে অবতরণ করেন তিনি। তবে এরপর এই বিমানের যাত্রীরা কোথায় গেছে তা নিশ্চিত নয়।

এদিকে ঢাকায় ইন্টারনেট সংযোগ চালু করা হয়। পুরো বাংলাদেশ উল্লাসে ফেটে পড়ে। মানুষ উৎসব করে শেখ হাসিনার ১৫ বছরের শাসনামলের অবসানের আনন্দ উদ্‌যাপন করে।

এই নারীকে একসময় দেখা হতো গণতন্ত্রের ধারক হিসেবে। তবে পরে বোঝা গেছে, তিনি তা ছিলেন না; বরং তিনি সেই নেতা, যিনি নেটসংযোগ বিচ্ছিন্ন করে পুরো দেশকে অন্ধকারে রেখে পালিয়ে গেছেন।

হাসিনার পদত্যাগ

FP

(*ফরেন পলিসি*-তে *হাসিনা স্টেপস ডাউন* শিরোনামে ৫ আগস্ট, ২০২৪ তারিখে এই প্রতিবেদনটি প্রকাশিত হয়)

সরকারি চাকরির কোটাব্যবস্থা নিয়ে কয়েক সপ্তাহের মারাত্মক গণবিক্ষোভের পর সোমবার পদত্যাগ করেছেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। স্থানীয় মিডিয়া জানিয়েছে, তিনি ভারতে পালিয়ে গেছেন। যদিও তিনি সেখানে থাকতে চান নাকি তৃতীয় কোনো দেশে যেতে চান তা স্পষ্ট নয়। বাংলাদেশ সেনাবাহিনী ঘোষণা করেছে, তারা আগামী দিনে তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত থাকবে।

এর আগে গত জানুয়ারিতে প্রধান বিরোধী দল বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপি ভোট বয়কট করার পর হাসিনা টানা চতুর্থ মেয়াদে প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হন।

সেনাপ্রধান জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামান বলেছেন—'দেশ একটি বিপ্লবী সময়ের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে।' শীঘ্রই রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিনের সঙ্গে ভবিষ্যতের নেতৃত্ব নিয়ে আলোচনা করবেন বলেও জানান তিনি। অন্তর্বর্তী সময়ে তিনি শান্তির আহ্বান জানিয়ে বিক্ষোভে নিহতদের জন্য ন্যায়বিচার নিশ্চিত করার প্রতিশ্রুতি দেন।

১৯৭১ সালে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে বাংলাদেশের স্বাধীনতার লড়াইয়ে যারা অংশগ্রহণ করেছিল, সরকারি চাকরিতে তাদের পরিবারের জন্য ৩০ শতাংশ কোটা সংরক্ষিত রাখা হয়। (সংখ্যালঘু এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্যও কোটা ছিল, যদিও সেগুলোকে বিতর্কিত হিসাবে বিবেচনা করা হয়নি।) বাংলাদেশের অনেক তরুণই মনে করেন, এই কোটাব্যবস্থা তাদের চাকরি পাওয়ার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড়ো অন্তরায়। বাংলাদেশে বর্তমানে মুদ্রাস্ফীতির হার অত্যন্ত বেশি এবং প্রায় এক-তৃতীয়াংশ যুবক বেকার। হাসিনা গত ৩০ বছরের মধ্যে ২০

বছর ক্ষমতায় ছিলেন। তিনি বিশ্বের সবচেয়ে দীর্ঘ সময় ক্ষমতাসীন নারী রাষ্ট্রনায়কদের মধ্যে অন্যতম। অনেকেই তার বিরুদ্ধে একদলীয় রাষ্ট্র গঠনের চেষ্টার অভিযোগ তুলে থাকেন।

ঢাকায় ২০১৮ সালে সহিংস বিক্ষোভের পর কোটাব্যবস্থা বাতিল করতে বাধ্য হয় সরকার। কিন্তু এই বছরের জুনে বাংলাদেশের একটি আদালত এই ব্যবস্থাকে ফের বহাল করলে নতুন করে বিক্ষোভ শুরু হয়। বিক্ষোভকারীদের দাবি পূরণে সুপ্রিমকোর্ট জুলাইয়ে কোটা কমিয়ে ৫ শতাংশে নামিয়ে আনে। তবে তাতে বিক্ষোভ থামেনি। শেষ পর্যন্ত এই বিক্ষোভ সরকার পতনের একদফা আন্দোলনে পরিণত হয়।

বিক্ষোভ শুরু হওয়ার পর থেকে প্রায় ৩০০ জন নিহত হয়েছেন। যার মধ্যে রয়েছে কমপক্ষে ৩২ জন শিশু। আহত হয়েছেন আরও কয়েক হাজার মানুষ। শুধু রবিবারই প্রায় ১০০ জন নিহত হন। আওয়ামী লীগের দপ্তর ও সরকারি ভবন লক্ষ্য করে ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ করে বিক্ষোভকারীরা। হাসিনা দেশ ছেড়ে পালিয়ে যাওয়ার পর বিক্ষোভকারীরা সোমবার দুপুরে ঢাকায় প্রধানমন্ত্রীর সরকারি বাসভবনে হামলা চালায়।

রবিবার জাতিসংঘের মানবাধিকার-বিষয়ক হাইকমিশনার ভলকার তুর্ক বলেন— "বাংলাদেশে সহিংসতা বন্ধ করতে হবে। মানবাধিকার সংস্থাগুলো বাংলাদেশি কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে বিক্ষোভকারীদের ওপর অতিরিক্ত শক্তিপ্রয়োগের অভিযোগ করে, যদিও সরকার এই ধরনের পদক্ষেপ অস্বীকার করেছে। হাসিনা পুলিশকে 'কঠোরভাবে নৈরাজ্যবাদীদের প্রতিহত করতে' বলেছেন বলে জানা গেছে।"

সরকার রবিবার সন্ধ্যা ৬টা থেকে দেশজুড়ে অনির্দিষ্টকালের জন্য কারফিউ ঘোষণা করে। সেই সাথে তিন দিনের ছুটিও দেওয়া হয়। যাহোক, সামরিক বাহিনী সোমবার ঘোষণা করে যে, মঙ্গলবার ভোরে কারফিউ শেষ হবে এবং স্কুল ও ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান আবার চালু করে দেওয়া হবে।

বাংলাদেশ-বিষয়ক বিশেষজ্ঞ সলিল ত্রিপাঠি গত মাসে ফরেন পলিসিতে লিখেছেন—'হাসিনার সমালোচকরা আশা করেন, এই মুহূর্তে একটি নতুন ধরনের নেতৃত্বের আবির্ভাব ঘটবে, যে নেতৃত্ব প্রথাগত রাজনৈতিক দলগুলো

থেকে নয়; বরং সেসব তরুণদের কাছ থেকে আসবে, যারা আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছেন।'

২০০৯ সালে শেখ হাসিনা ক্ষমতাসীন হওয়ার পর থেকে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয় ভোটারদের ভীতিপ্রদর্শন, দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি এবং রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে সহিংসতার। সোমবার দেশটির রাষ্ট্রপতি নির্দেশ দেন কারাবন্দি সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বিরোধী দলীয় নেত্রী খালেদা জিয়াকে মুক্ত করার।

পানি
লাগবে
পানি?

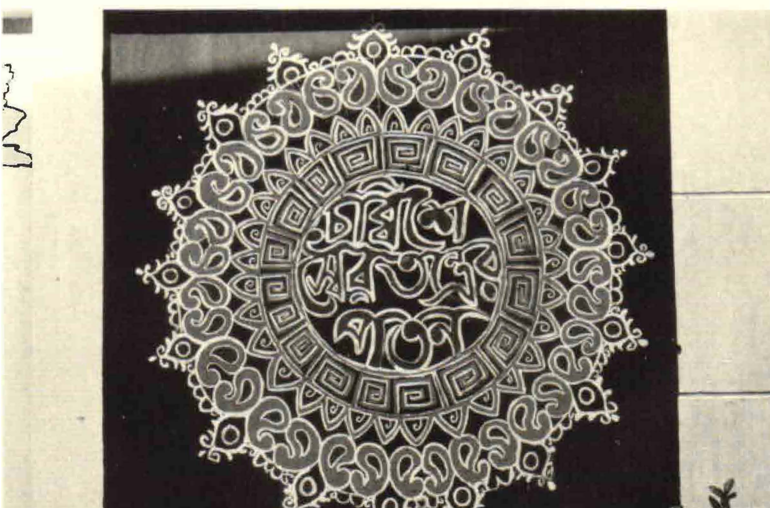

বাংলাদেশের ছাত্র আন্দোলনের বিজয় অবাক করা ঘটনা নয়

ALJAZEERA

(*আল-জাজিরা*'র জন্য এই প্রতিবেদন লেখেন জেনিফার চৌধুরী। *দ্য ভিকটরি অব বাংলাদেশ'স স্টুডেন্ট মুভমেন্ট শুড নট সারপ্রাইজ এনিওয়ান* শিরোনামে প্রতিবেদনটি প্রকাশিত হয় ৫ আগস্ট।)

আবু সাঈদের বয়স ২৫। কৃষক পরিবারের এ তরুণ তার মা-বাবার নয় সন্তানের একজন। বাংলাদেশের একটি প্রধান বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখাপড়া করতেন বৃত্তি নিয়ে। তার স্বপ্ন ছিল সরকারি চাকরি করার। যে চাকরি তাকে অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতার নিশ্চয়তা দেবে। হয়তো তার পরিবারকেও গতিশীলতা দেবে এ চাকরি। কিন্তু সরকারি চাকরির কোটায় ৩০ শতাংশ রাখা হয়েছে মুক্তিযোদ্ধাদের বংশধরদের জন্য। এই কোটাব্যবস্থা তার স্বপ্নকে অনেকখানি অসম্ভব করে তোলে।

বর্তমানে বাংলাদেশে বেকার তরুণদের সংখ্যা প্রায় ১ কোটি ৮০ লাখ। আবু সাঈদ এ তথ্য জানতেন। স্নাতক সম্পন্ন করার পর তিনি এই ভয়াবহ পরিসংখ্যানে আরেকটি সংখ্যা হিসেবে যুক্ত হতে চাননি। কাজেই কোটাব্যবস্থা সংস্কারের দাবিতে দেশজুড়ে যে 'বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন' শুরু হয়, তাতে অন্যতম প্রধান সমন্বয়কের ভূমিকায় নামেন আবু সাঈদ।

এই আন্দোলনেরই এক বিক্ষোভ চলাকালে বাংলাদেশের পুলিশ বাহিনীর কাছ থেকে মাত্র ১৫ মিটার দূরে দাঁড়িয়ে ছিলেন আবু সাঈদ। দু-দিকে দু-হাত প্রসারিত করে বুক পেতে দেন পুলিশের গুলির সামনে।

পুলিশের গুলিতেই আবু সাঈদের মৃত্যু হয়।

বিচারবহির্ভূত এই হত্যাকাণ্ডের ভিডিও দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ে অনলাইন প্লাটফর্মগুলোতে। সারা দেশের হাজারো শিক্ষার্থীকে টেনে রাস্তায় নামিয়ে আনে ওই ভিডিও। তাদের সঙ্গে সংহতি প্রকাশ করে পথে নামেন শিক্ষাবিদ,

আইনজীবী, শিক্ষার্থীদের মা-বাবা এবং রিকশাওয়ালা থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষ। সরকারি দলের ছাত্রসংগঠন ও সশস্ত্র বাহিনীর হাতে আবু সাঈদসহ আরও দুই শতাধিক বিক্ষোভকারীর মৃত্যু ক্ষুব্ধ করে তোলে তাদের।

তাদের প্রচেষ্টা ও যে ঝুঁকি তারা নিয়েছেন তা বৃথা যায়নি। হাইকোর্ট কোটাব্যবস্থা পুনর্বিবেচনা করে সরকারি চাকরিতে ১৯৭১ সালে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা মুক্তিযোদ্ধাদের নাতি-নাতনিদের জন্য ৭ শতাংশ কোটার ব্যবস্থা রাখেন। তবে এত বড়ো পরিবর্তন আনার পরও তা অসন্তোষ বন্ধ করতে ব্যর্থ হয়।

হাইকোর্টের এ সিদ্ধান্তে পৌছার আগেই শিক্ষার্থীদের ওপর যে সহিংসতা চালানো হয়, তার তদন্তের দাবিতে আবারও আন্দোলন শুরু করে ছাত্ররা। তাদের দাবি শুধু কোটাপদ্ধতির সংস্কারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না। তারা যথাযথ ও পদ্ধতিগত পরিবর্তনের দাবি তোলে। তারা একটি নতুন সরকার চায়। তারা শেখ হাসিনার পদত্যাগ দাবি করে। বিশ্বের বেশিরভাগ দেশকে হতবাক করে দিয়ে আজ তাদের সে দাবি পূরণ হয়েছে।

শিক্ষার্থীদের এই আন্দোলন নস্যাৎ করা সম্ভব নয় বুঝতে পেরে শেখ হাসিনা পদত্যাগ করে একটি সামরিক বিমানে করে দেশ ছেড়ে গেছেন। ছাত্র-জনতার এই আন্দোলনই বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করে দিয়েছে।

আবু সাঈদের মতো তরুণদের নেতৃত্বে গড়ে ওঠা এই ছাত্র আন্দোলন ১৫ বছর ধরে ক্ষমতা আঁকড়ে থাকা এক স্বৈরাচারী শাসককে ক্ষমতা ছেড়ে পালিয়ে যেতে বাধ্য করে। ১৫ বছর ক্ষমতা ধরে থাকলেও মাত্র পাঁচ সপ্তাহের আন্দোলনকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেননি তিনি।

এই আন্দোলনের সাফল্যই প্রমাণ করে দেয়, বাংলাদেশের মানুষ মানবাধিকার, বাক্স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের বিনিময়ে অর্থনৈতিক উন্নয়ন চায় না। বাস্তবতা হচ্ছে, শেখ হাসিনা ও তার দল আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে গত দশকে বাংলাদেশের মানুষ অর্থনৈতিকভাবে বেশ অনেকটা এগিয়েছে। তবে অর্থনৈতিক অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে সরকার ধারণা করতে শুরু করে তাদের আর মানবাধিকার নিশ্চিত করার প্রয়োজন নেই, ব্যক্তিস্বাধীনতার প্রয়োজন নেই, চাইলেই বিরোধী দলগুলোকে নিষিদ্ধ করে দেওয়া যায়, আইনকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখানো যায় এবং গণতন্ত্রের মূল শর্তগুলোও তারা লঙ্ঘন করতে পারে।

গত ১৫ বছর ধরে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রতিনিয়ত মানুষকে মনে করিয়ে দিয়েছেন যে, তিনি এই স্বল্পোন্নত দেশে দারিদ্র্য অর্ধেকে নামিয়ে এনেছেন। বহু সাংবাদিক, মানবাধিকারকর্মী তার আমলে নিহত হয়েছেন বা জেলে গেছেন। অনেকেই নিখোঁজ। এসব ত্রুটি থেকে দৃষ্টি ফেরাতে অর্থনৈতিক অগ্রগতির বিষয়টিকে বারবার ব্যবহার করেছেন তিনি।

হাসিনা মানুষকে বোঝাতে চেয়েছেন, অর্থনৈতিক অগ্রগতি অর্জনের জন্য মানবাধিকার লঙ্ঘন, নির্যাতন, দুর্নীতি ও বৈষম্যের মতো বিষয়গুলোকে মেনে নিতে হবে। কিন্তু এ বিষয়গুলোই তার জন্য বিচারের দণ্ড হয়ে হাজির হয়েছে।

গত এক দশক বা তার চেয়েও বেশি সময় ধরে একটি নতুন প্রজন্ম গড়ে উঠেছে। এরাই পুরো দেশের মানসিকতা পালটে দিয়েছে।

১৯৭১ সালে পাকিস্তানের কাছ থেকে স্বাধীনতা লাভ করে বাংলাদেশ। স্বাধীনতার পরও মানুষের মনে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর অত্যাচারের ভীতিকর চিত্র জাগরূক রয়ে যায়। রাজনৈতিক ভারসাম্যহীনতা ও অন্যায়ের কারণে ভেঙে যায় পাকিস্তান। এরপর বাংলাদেশের মানুষ দুভাবে কাজ করার চেষ্টা করে। প্রথমত, তার চলমান ব্যবস্থার মধ্যে থেকেই চেষ্টা চালিয়ে যায়। দ্বিতীয়ত, ওই ব্যবস্থাকেই ভেঙে ফেলার চেষ্টা করে।

বাস্তবতা হচ্ছে, আমাদের মা-বাবার প্রজন্মের বহু মানুষ একটি নিশ্চিত ভবিষ্যতের আশায় আশি ও নব্বইয়ের দশকে দেশ ছেড়ে যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ইউরোপ এমনকি মধ্যপ্রাচ্যে স্থায়ী হওয়ার চেষ্টা করে। আর যারা দেশে থেকে যান, তারা বাঁচার চেষ্টা করেন মাথা নিচু করে। সরকারের কোনো সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধেই তারা নিজেদের মত মন খুলে প্রকাশ করতে পারেননি।

তবে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে জেন-জি তৃতীয় পথটিতে হাঁটতে শুরু করে। তারা তাদের মা-বাবার মতো পশ্চিমা দেশগুলোর দিকে ছুটতে চায়নি বা নির্দিষ্ট ব্যবস্থার মধ্যে থেকেও কাজ করে যেতে চায়নি। তাদের স্বপ্ন হলো—দেশে থেকেই দেশের সংস্কার। তারা প্রয়োজনীয় অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য একটি দুর্নীতিগ্রস্ত সরকারের মানবাধিকার লঙ্ঘনকে মেনে নিতে চায়নি।

২০১৮ সাল থেকে ২০২০ সালের মধ্যে বাংলাদেশে বিদেশি মিডিয়ার প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করার সময় আমি কয়েক ডজন তরুণের সঙ্গে কথা বলেছি।

তাদের প্রায় সবাই দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতি ও প্রযুক্তিগত উৎকর্ষ নিয়ে দারুণ গর্বিত। তবে গণতন্ত্র ও মানবাধিকারের অনুপস্থিতি নিয়েও ক্ষুব্ধ ছিল তারা। তারা তাদের দেশকে ভালোবাসে। তারা পরিস্থিতির উন্নতিসাধনের মাধ্যমে দেশের উন্নয়ন ঘটাতে চায়। তারা চুপ করে বসে থাকার মানুষ নয়।

প্রাথমিকভাবে মনে হতে পারে, শিক্ষার্থীরা মাত্র পাঁচ সপ্তাহের আন্দোলনের মাধ্যমে শেখ হাসিনা সরকারকে ফেলে দিয়েছে। তবে বিষয়টি তেমন নয়। কয়েক বছরের প্রস্তুতির ফসল এই বিপ্লব। এ বছর যারা শিক্ষার্থীদের আন্দোলনে যোগ দিয়েছে, যারা জীবন দিয়েছে, তারা এই সরকারের ক্রমেই স্বৈরাচারী হয়ে ওঠা দেখতে দেখতেই বেড়ে উঠেছে।

বহু মানুষ তাদের যৌবন পার করে দিয়েছে উন্নয়ন ধরে রেখে গণতন্ত্রের অবনতি রোধ করার পথ খুঁজতে গিয়ে। ২০১৮ সালে একটি বাস নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দুই শিক্ষার্থীর ওপর উঠে যায়। সেখানেই নিহত হয় ওই কিশোর-কিশোরী। এ সময়ই জন্ম নেয় 'নিরাপদ সড়ক আন্দোলন'। পাঁচ দিন রাস্তার দখল ছিল শিক্ষার্থীদের হাতে। তারা গাড়ির লাইসেন্স দেখত, ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ করত, যা বাংলাদেশের বাস্তবতায় অত্যন্ত দুরূহ একটি কাজ। ওই একই বছর শিক্ষার্থীদের আন্দোলনে কোটাব্যবস্থা বিলুপ্ত হয়। ২০১৯ সালে ফেসবুকে একটি পোস্ট দেওয়ার জন্য সরকারি দলের ছাত্রসংগঠনের সদস্যদের হাতে এক শিক্ষার্থী নিহত হওয়ার পর আবারও রাস্তায় নেমে আসে শিক্ষার্থীরা।

সব আন্দোলনের সময়ই শিক্ষার্থীরা লক্ষ করে, সরকার সহিংসতার জন্য বিরোধী দলকে দোষারোপ করছে। যদিও বেশিরভাগ সময়ই সহিংসতার জন্য দায়ী সরকারি দলের নিজেদের ছাত্রসংগঠনের কর্মীরা। তরুণরা দেখতে পায়, তাদের বড়োরা দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য বর্তমান সরকারের সব ব্যবস্থা ও নীতির প্রতি নিঃশর্ত সমর্থন দিয়ে যাওয়ার পক্ষপাতী। ফলে বারবার ছাত্রদের বিপ্লবী চেতনা হোঁচট খেয়েছে। তবে তারা হাল ছাড়েনি। মধ্য বিশের এসব তরুণ-তরুণী স্বপ্নকে বাঁচিয়ে রাখতে তাদের লেখাপড়া আর বোধশক্তিকে প্রাধান্য দিয়েছে। দমবন্ধ করা সরকারের শাসন থেকে বাংলাদেশকে মুক্ত করতে চেয়েছে তারা। তারা দেশকে সেই জায়গায় নিয়ে যেতে চেয়েছে, যে জায়গার যোগ্য এ দেশ। তারা একটি গণতান্ত্রিক দেশ গঠন করতে চেয়েছে, যে দেশে সব নাগরিকের জন্য সমান অধিকার নিশ্চিত করা হবে।

পাঁচ সপ্তাহের রক্তপাত, যন্ত্রণা, আতঙ্কের পর আজ তাদের স্বপ্ন সত্যি হয়েছে। তরুণ বাংলাদেশিরা এখন দেশের দায়িত্বে। তরুণরা তাদের জীবনে সম্ভবত প্রথমবারের মতো তাদের ভবিষ্যৎ নিয়ে আশাবাদী।

নিশ্চিতভাবেই এখন সেনাবাহিনীর নজরদারিতে বাংলাদেশে এক তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠিত হবে। অনেকেই অবশ্য এই বিষয়টি নিয়ে উদ্‌বিগ্ন। কারণ, তাদের অতীত অভিজ্ঞতা সুখকর নয়। কারণ, এ ধরনের সরকার মানবাধিকার ও গণতান্ত্রের সুরক্ষার জন্য আদর্শ নয়। তবে ছাত্রনেতারা নিশ্চিত করেছেন, এই অন্তর্বর্তী সরকার আগের সরকারগুলোর মতো হবে না। তারা প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, তারা এই সরকারকে সীমালঙ্ঘন করতে দেবেন না এবং ক্ষমতা জনগণের হাতেই থাকবে। আমি জানি, তারা তাদের কথা রাখবেন। কারণ, এটা তাদের দেশ, তাদের ভবিষ্যৎ এবং স্বপ্নপূরণে তারা তাদের সবটুকু বাজি রেখে লড়াই করে গেছে।

এই বিপ্লব শুধু বাংলাদেশ নয়, বিশ্বে দীর্ঘদিন ধরে ক্ষমতা আঁকড়ে থাকা সব শাসকের জন্যই একটি বিশেষ বার্তা বহন করে। তরুণরা যেন বলছে—'স্বৈরশাসকদের সময় শেষ।' নতুন প্রজন্মের ছেলেমেয়েরা তাদের অধিকার ছেড়ে দেবে না। তারা ব্যক্তিস্বার্থকে বিসর্জন দিয়ে ন্যায়বিচারকে সমুন্নত রাখতে লড়াই করতে প্রস্তুত। তারাই এখন ক্ষমতায়। কাজেই পরিবর্তন আসবেই। তাদের সহযাত্রী হতে হবে আমাদের সবাইকে।

সালাম
নতুন
বাংলাদেশ

রক্ত চোষা
এসেছিল
তোমার দেশে
নাই
BANG
LAD
ESH

নোবেলজয়ীকে নতুন সরকারের উপদেষ্টা হিসেবে দেখতে চান বাংলাদেশের বিক্ষোভকারীরা

The New York Times

(*নিউইয়র্ক টাইমস*-এ ৬ আগস্ট '*বাংলাদেশ প্রোটেস্টারস ওয়ান্ট নোবেল লরেট টু অ্যাডভাইস নিউ গভর্নমেন্ট*' শিরোনামে এই প্রতিবেদনটি প্রকাশিত হয়। লিখেছেন কাসিম নোমান)

বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পদত্যাগ করে পালিয়ে যাওয়ার মাত্র একদিন পর গণ-অভ্যুত্থানে নেতৃত্বদানকারী ছাত্ররা অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান হিসেবে মুহাম্মদ ইউনূসের নাম ঘোষণা করেছেন। শান্তিতে নোবেলজয়ী ড. ইউনূসকে ক্ষুদ্রঋণ ধারণার জনক হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

বাংলাদেশের অন্যতম বিখ্যাত নাগরিক ড. ইউনূস। শেখ হাসিনা যাদের রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ হিসেবে বিবেচনা করতেন, তাদের মধ্যে তিনি অন্যতম। বরাবরই তার তীব্র সমালোচনা করে এসেছেন হাসিনা। এখন হাসিনাকে যারা উৎখাত করেছেন, তারা চান ড. ইউনূস (৮৪) নতুন সরকারের সবচেয়ে শক্তিশালী পদটি গ্রহণ করুন।

ছাত্রনেতাদের অন্যতম নাহিদ ইসলাম মঙ্গলবার সকালে বলেন—'ড. মুহাম্মদ ইউনূসকে প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে নিয়োগ করে একটি অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠন করতে চাই আমরা। আমরা ড. ইউনূসের সঙ্গে কথা বলেছি, তিনি এ গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বগ্রহণে তার সম্মতির কথা জানিয়েছেন।'

তবে নতুন সরকারের গঠন এবং এতে ড. ইউনূসের ভূমিকার ব্যাপারে এই শিক্ষার্থীরা কতটুকু প্রভাব রাখতে পারবেন, তা এখনও নিশ্চিত না। দেশের সেনাবাহিনী ও রাজনৈতিক দলগুলোও এ নিয়ে তাদের মতামত দেবে।

ড. ইউনূস ও বাংলাদেশে তার বেড়ে ওঠা সম্পর্কে যা জানা প্রয়োজন

ক্ষুদ্রঋণের প্রবক্তা হিসেবে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন ড. ইউনূস।

ড. ইউনূস ১৯৪০ সালে চট্টগ্রাম শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৯৬০-এর দশকে ফুলব্রাইট স্কলারশিপে যুক্তরাষ্ট্রে যান। ভ্যান্ডারবিল্ট বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে পিএইচডি ডিগ্রি লাভ করেন।

ড. ইউনূস ১৯৭০-এর দশকের প্রথম দিকে বাংলাদেশে ফিরে এসে একটি প্রকল্প চালু করেন, যা দরিদ্রদের মধ্যে ক্ষুদ্রঋণ প্রদান করে থাকে। ১৯৮৩ সালে সেই পরিষেবাটি গ্রামীণ ব্যাংকে পরিণত হয়। পরবর্তী দশকে ব্যাংকটি ক্রমাগত সম্প্রসারিত হয়। এটি ব্যাপক সাফল্য লাভ করে। বিশেষ করে নারীদের ঋণ প্রদান করে গ্রামীণ ব্যাংক। বর্তমানে কয়েক ডজন দেশ ক্ষুদ্রঋণ প্রকল্পের মডেল অনুসরণ করে। কাজের ধরন ও সাফল্যের জন্য বিশ্বের বহু নেতার প্রশংসা অর্জন করে গ্রামীণ ব্যাংক।

ড. ইউনূস ও গ্রামীণ ব্যাংক ২০০৬ সালে শান্তিতে নোবেল পুরস্কার পান। পুরস্কার কমিটি দরিদ্রদের আর্থিক সুযোগ দেওয়ার জন্য তাকে ও গ্রামীণ ব্যাংককে এ পুরস্কার প্রদানের সিদ্ধান্ত নেয়।

যদিও মডেলটি সবার পছন্দ ছিল না। কিছু ক্ষুদ্রঋণ অপারেটর অতিরিক্ত সুদের হার এবং দরিদ্রদের ঋণ দেওয়ায় অনিয়মের অভিযোগ তোলে।

গ্রামীণ ব্যাংকের সাফল্যের সাথে সাথে ড. ইউনূস আন্তর্জাতিক ও রাষ্ট্রীয়ভাবেও সম্মানিত হন। প্রবল জনপ্রিয়তা সত্ত্বেও রাজনীতিতে জড়াননি তিনি। কিন্তু ২০০৭ সালে পরিস্থিতিতে পরিবর্তন আসে। ওই সময় বাংলাদেশে একটি সেনাসমর্থিত অন্তর্বর্তী সরকার ছিল। ওই সময় ড. ইউনূস একটি রাজনৈতিক দল গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করেন, যা একটি দুর্নীতিমুক্ত রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান গড়তে সংকল্পবদ্ধ ছিল। সেই দল অবশ্য বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। ড. ইউনূস পরে রাজনীতি করার পরিকল্পনা থেকে সরে আসেন। তবে তার রাজনীতি করার সিদ্ধান্ত শেখ হাসিনাসহ বহু রাজনীতিককে ক্ষুব্ধ করেছিল। পরবর্তী সময়ে তার বিরুদ্ধে অসংখ্য মামলা দায়ের করা হয়।

শেখ হাসিনা ২০০৮ সালের নির্বাচনে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনের মাধ্যমে ক্ষমতায় এলেন। বছরের পর বছর রাজনৈতিক অস্থিরতার পর তিনি দেশকে গণতান্ত্রিক ধারায় ফেরানোর প্রতিশ্রুতি দেন। তবে হাসিনার সমালোচকরা বলছেন, তিনি তার ১৫ বছরের শাসনামলে তার রাজনৈতিক বিরোধীসহ ড. ইউনূসকে হেনস্থা করার জন্য ক্ষমতার অপব্যবহার করেছেন।

হাসিনা ক্ষুদ্রঋণদাতাদের 'গরিবের রক্ত চুষে খায়' ও 'সুদখোর' বলে অভিযুক্ত করেন। গ্রামীণ ব্যাংকে ড. ইউনূসের ভূমিকা নিয়ে ওই সময় প্রশ্ন তোলা হয়। গ্রামীণ ব্যাংকের কাজের ধরন নিয়েও অনিয়মের অভিযোগ ওঠে।

বাংলাদেশের একটি সংবাদমাধ্যম *নিউ এজ*-এর প্রতিবেদন অনুসারে, সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ড. ইউনূসের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগসহ ১৭৪টি মামলা করা হয়। কয়েক বছর ধরে মানবাধিকার সংস্থাগুলো বলে আসছে, ইউনূসের বিরুদ্ধে দায়ের করা মামলাগুলোকে রাজনৈতিক প্রতিহিংসাপরায়ণতার উদাহরণ হিসেবে ব্যবহার.করা যেতে পারে।

ড. ইউনূস অবশ্য কোনো অন্যায়ের সঙ্গে যুক্ত থাকার কথা অস্বীকার করেছেন। পরবর্তী সরকারে তার সম্ভাব্য ভূমিকা সম্পর্কে ছাত্রসংগঠনগুলোর বক্তব্যের বিষয়ে মন্তব্য করার জন্য মঙ্গলবার তাকে তাৎক্ষণিকভাবে পাওয়া যায়নি।

স্বৈরাচার
মাফিয়া
তন্ত্র
আর
কখনো
না

সোনার
মানচিত্রে
রক্তের
দাগ
বসে
গেছে

শেখ হাসিনা :
একটি ভুল এবং ১৫ বছরের শাসনের অবসান

ALJAZEERA

(আল-জাজিরা'য় ৫ আগস্ট শেখ হাসিনা : অ্যা ক্রিটিক্যাল মিসস্টেপ অ্যান্ড দ্য এন্ড অব ফিফটিন ইয়ার্স রুলিং বাংলাদেশ শিরোনামে এই প্রতিবেদনটি প্রকাশিত হয়। লিখেছেন ফয়সাল মাহমুদ)

ঘটনার সূচনা একটি শব্দ থেকে—'রাজাকার'।

বাংলাদেশে 'রাজাকার' অত্যন্ত আপত্তিকর একটি শব্দ। এ শব্দের অর্থ স্বেচ্ছাসেবক। তবে রাজাকার বলতে তাদেরই বোঝানো হয়, যারা ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীকে সহায়তা করেছিল। তাদের বিরুদ্ধে নৃশংস অপরাধে জড়িত থাকার অভিযোগ রয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা (৭৬) টানা ও বিস্তৃত অসন্তোষের পর গত সোমবার পদত্যাগ করে একটি সামরিক হেলিকপ্টারে দেশ ছেড়ে পালিয়ে যান। কাউকে হুমকি বা ভিন্নমতাবলম্বী বলে মনে হলে শেখ হাসিনা 'রাজাকার' শব্দটি তার জন্য ব্যবহার করতেন। তার ১৫ বছরের ক্ষমতাসীন সময়ে এটি ছিল সবচেয়ে সাধারণ চর্চা।

বাংলাদেশের স্থপতি ও সাবেক প্রেসিডেন্ট শেখ মুজিবুর রহমানের কন্যা হাসিনা ১৯৯০ সালে তৎকালীন সামরিক শাসক হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদকে ক্ষমতাচ্যুত করার জন্য গণতান্ত্রিক আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন।

১৯৯৬ সালে নির্বাচনে আওয়ামী লীগ জয়ী হওয়ার পর হাসিনা প্রথমবারের মতো প্রধানমন্ত্রী হন। ২০০৯ সালে তিনি আবারও ক্ষমতায় আসেন। তার শাসনামলে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নতি ঘটে। তবে সময়ের ব্যবধানে তিনি কর্তৃত্বপরায়ণ শাসকে পরিণত হন। তার সময়ে বাংলাদেশে বাক্‌স্বাধীনতা হরণ, ভিন্নমতাবলম্বী ও বিরোধীদের কঠোর হাতে দমন করা হয়।

বাংলাদেশের বর্তমানে বিশ্বের অষ্টম জনবহুল দেশ। দেশটির জনসংখ্যা ১৭ কোটি। বাংলাদেশে সবচেয়ে দীর্ঘসময় ধরে ক্ষমতাসীন নারীনেত্রী শেখ হাসিনা। তার বিরুদ্ধে র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়নসহ নিরাপত্তা বাহিনীকে ব্যবহার করে বিরোধী দলের সদস্য ও ভিন্নমতালম্বীদের অপহরণ এমনকি হত্যার অভিযোগও রয়েছে। এ ছাড়াও বলা হয়ে থাকে, তিনি দেশের নির্বাচন প্রক্রিয়াকেই নষ্ট করে ফেলেছেন।

সমালোচকদের দাবি, বিচারব্যবস্থাকেও তার আমলে দলীয়করণ করা হয়। এমনকি তার মতের বিরুদ্ধে রায় দেওয়ার জন্য একজন বিচারককে দেশ ছেড়েও পালাতে হয়।

মূলধারার গণমাধ্যমও ছিল তার কড়া নিয়ন্ত্রণে। সমালোচকরা বলছেন, গণমাধ্যমে প্রধানমন্ত্রীর পছন্দমতো সংবাদ প্রচার করা হতো। বাংলাদেশের বেশিরভাগ সংবাদমাধ্যমই শেখ হাসিনার দল আওয়ামী লীগপন্থি ব্যবসায়ীদের মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান। মিডিয়ায় হাসিনার সমর্থকদের দেশের স্বাধীনতার একমাত্র বৈধ উত্তরসূরি হিসেবে প্রচার করা হয়। তাদের প্রচার ছিল অনেকটা এমন যে, দেশের সমস্ত কল্যাণ তাদের কারণেই সাধিত হয়েছে। বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপি ও জামায়াতে ইসলামীর মতো ভিন্নমতাবলম্বী রাজনৈতিক দলকে এবং রাজনৈতিক বিরোধীদের দেখানো হতো বিশ্বাসঘাতক ও চরমপন্থি হিসেবে।

সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও প্রধান বিরোধী দলীয় নেত্রী বেগম খালেদা জিয়াকে ২০১৮ সালে দুর্নীতির অভিযোগে কারাগারে নেওয়া হয়। জামায়াতে ইসলামীর শীর্ষ নেতাদের স্বাধীনতাযুদ্ধে বিরোধিতার অভিযোগ এনে ২০১৬ সালে ফাঁসিতে ঝোলানো হয়।

হাসিনা একই কায়দায় ছাত্রদের আন্দোলনকে রুখে দিতে তাদের বিরুদ্ধে 'রাজাকার' শব্দটি প্রয়োগ করেন। হাসিনার জীবনের সবচেয়ে বড়ো ভুল ছিল হয়তো-বা এটাই।

কঠোর প্রতিক্রিয়াই আগুন ধরিয়ে দেয়

১৪ জুলাই সংবাদ সম্মেলনে হাসিনাকে এক সাংবাদিক প্রশ্ন করেন চাকরিতে কোটাব্যবস্থার বিরুদ্ধে ছাত্র আন্দোলন প্রসঙ্গে। ওই সময় ছাত্র আন্দোলনের বয়স ছিল এক সপ্তাহের কিছু বেশি।

জবাবে হাসিনা বলেন—'মুক্তিযোদ্ধাদের নাতি-নাতনিরা যদি (কোটা) সুবিধা নিতে না পারে তাহলে কারা পাবে? রাজাকারের নাতি-নাতনিরা?'

তার এই মন্তব্যের পর তাৎক্ষণিকভাবে বিক্ষোভ আরও তীব্র হয়ে ছড়িয়ে পড়ে। শিক্ষার্থীরা প্রধানমন্ত্রীর অন্যায্য বক্তব্যের প্রতিবাদ করে। সরকারি চাকরিতে কোটাব্যবস্থা বাতিলের তাদের দাবি প্রধানমন্ত্রী যেভাবে নাকচ করে দিয়েছে, তা তারা ভালোভাবে গ্রহণ করেনি। উল্লেখ্য, কোটাপ্রথায় ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ করা ব্যক্তিদের উত্তরসূরিদের জন্য ৩০ শতাংশ আসন বরাদ্দ রাখা হয়।

প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যের কয়েক ঘণ্টার মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা বিক্ষোভে ফুঁসে ওঠে। শিক্ষার্থীরা স্লোগান দেয়—'তুমি কে? আমি কে? রাজাকার, রাজাকার।'

হাসিনাও কঠোরভাবে এ বিক্ষোভের জবাব দেন। তার দলের ছাত্রসংগঠন বাংলাদেশ ছাত্রলীগ ও পুলিশ বাহিনী মিলে এই বিক্ষোভ দমনের চেষ্টা করে। এর ফলে ১৬ জুলাই সহিংসতায় ছয় জন নিহত হয়। এর পরের চার দিনে পুলিশ ও ছাত্রলীগের ক্যাডারদের গুলিতে নিহত হয় দুই শতাধিক মানুষ, যার বেশিরভাগই শিক্ষার্থী। সাধারণ জনগণও রয়েছে।

সহিংসতাকে নিন্দা জানানোর পরিবর্তে হাসিনা মেট্রোরেল ও সরকারি টেলিভিশন সেন্টারের মতো সম্পদের ক্ষয়ক্ষতির দিকে বেশি মনোযোগী হন। এতে শিক্ষার্থীরা আরও ক্ষুব্ধ হয়। তারা প্রাথমিকভাবে নয় দফা দাবি তোলে। এর মধ্যে একটি ছিল হাসিনাকে নিঃশর্তভাবে ক্ষমা চাইতে হবে এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খানসহ কয়েকজন মন্ত্রীর পদত্যাগ দাবি করে। ছাত্রদের নয় দফা দাবি শেষ পর্যন্ত এক দফায় পরিণত হয়—হাসিনার পদত্যাগ।

হাসিনার ক্ষমতায় আরোহণ

১৯৪৭ সালে পূর্ব-পাকিস্তানে জন্ম নেওয়া শেখ হাসিনা তরুণ বয়স থেকেই রাজনৈতিকভাবে সক্রিয় ছিলেন। তার পিতা শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭১ সালে বাংলাদেশকে পাকিস্তান থেকে স্বাধীনতা আদায়ের সংগ্রামে নেতৃত্ব দেন এবং প্রথম রাষ্ট্রপতি হন। ততদিনে হাসিনা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখাপড়া করছেন। ছাত্ররাজনীতিতে তার একটি পরিচিতিও তৈরি হয়ে গেছে।

১৯৭৫ সালের এক সামরিক অভ্যুত্থানে হাসিনার পিতা শেখ মুজিব ও তার পরিবারের বেশিরভাগ সদস্য নিহত হন। বিদেশ থাকার কারণে শেখ হাসিনা ও তার ছোটো বোন শেখ রেহানা বেঁচে যান।

ভারতে বেশ কয়েক বছর নির্বাসিত জীবন কাটানোর পর হাসিনা ১৯৮১ সালে বাংলাদেশে ফিরে এসে আওয়ামী লীগের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। তিনি জেনারেল হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদের সামরিক সরকারের বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক বিক্ষোভ সংগঠিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

হাসিনা প্রথম প্রধানমন্ত্রী হন ১৯৯৬ সালে। ভারতের সঙ্গে পানি বণ্টন এবং দক্ষিণ-পূর্ব বাংলাদেশের কয়েকটি উপজাতীয় যোদ্ধা গ্রুপের সঙ্গে শান্তিচুক্তি করেন তিনি। তবে তার প্রশাসনের বিরুদ্ধে ব্যাপকভাবে দুর্নীতি এবং ভারত তোষণের অভিযোগ ওঠে। এর কারণেই পরবর্তী সময়ে তার চিরবৈরী খালেদা জিয়া ক্ষমতায় আসেন।

২০০৮ সালে আবারও শেখ হাসিনা ক্ষমতায় ফেরেন। এ দফা তিনি টানা ১৬ বছর ক্ষমতায় ছিলেন। তার এবারের পুরো মেয়াদজুড়ে ছিল ব্যাপক-বিস্তৃত রাজনৈতিক গ্রেফতার, হত্যা, অপহরণ, গুম ও বিচারবহির্ভূত হত্যার অভিযোগ।

কলঙ্কিত উত্তরাধিকার

জবান সাময়িকীর সম্পাদক রেজাউল করিম রনি *আল-জাজিরাকে* বলেন—'মানবতাবিরোধী অপরাধের জন্য শেখ হাসিনার বিচার হওয়া উচিত। হাসিনা সন্ত্রাস, আইনের অপব্যবহার এবং নিরাপত্তা বাহিনীর মাধ্যমে তার স্বৈরাচারী শাসন চালিয়ে গেছেন।'

হিউম্যান রাইটস ওয়াচের মতে, হাসিনা ক্ষমতায় আসার পর থেকে অন্তত ৬০০ মানুষ গুম হন, যাদের আর খোঁজ পাওয়া যায়নি।

২০১৫ সালের জানুয়ারি থেকে ২০২০ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত অন্তত ৭৫৫ জনকে সন্ত্রাসী বা চরমপন্থি আখ্যা দিয়ে নিরাপত্তা বাহিনী বিচারবহির্ভূতভাবে হত্যা করেছে।

রনি আরও বলেন—'হাজারো মানুষ তাদের বাড়িঘর ছেড়ে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছে। বছরের পর বছর মানুষ বাধ্য হয়েছে লুকিয়ে থাকতে। কারণ, হাসিনা ও তার পুলিশ বাহিনী এদের নানাভাবে হেনস্তা ও নির্যাতন করেছে।'

রাজনৈতিক বিশ্লেষক জাহেদ উর রহমান *আল-জাজিরাকে* বলেন—'হাসিনা দেশের সবচেয়ে বড়ো ক্ষতি যা করেছেন তা হলো বিচার বিভাগ, নির্বাচন কমিশন, গণমাধ্যম, আইনপ্রয়োগকারী সংস্থার মতো দেশের মূল প্রতিষ্ঠানগুলোকে দুর্নীতিগ্রস্ত করে ফেলা। এই প্রতিষ্ঠানগুলোর সংস্কার করতে দীর্ঘ সময় লেগে যাবে।'

হাসিনা অবশ্য বরাবরই দাবি করে এসেছেন, তিনি দুর্নীতি নির্মূল করছেন। তবে সমালোচকরা বলছেন, এই সমস্যা সমাধানে সরকার গুরুত্ব দিচ্ছে এমন কোনো প্রমাণ নেই।

এ ছাড়া হাসিনা বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের বর্ণনা পালটে দিয়ে দেশের ঐতিহ্যকেও কালিমা মাখিয়েছেন। রহমান বলেন—'হাসিনা রাজাকার বলে সম্বোধন করায় ক্ষেপে উঠেছিলেন শিক্ষার্থীরা। এরপর বিক্ষোভ প্রদর্শনের অংশ হিসেবে তারাই নিজেদের রাজাকার বলতে শুরু করে।'

শেষ পর্যন্ত এটাই তার পতনের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

বলেছিল
"রাজাকার"
ভেঙে দিলাম
রাজার আকার

BLOODY
JULY
রক্তের বন্যায় ভেসে যাবে অন্যায়

আমরা এই সরকারের পতন ঘটিয়েছি, প্রয়োজনে আবার ঘটাব

The Guardian

(প্রতিবেদনটি ছাপা হয় ব্রিটিশ দৈনিক *দ্য গার্ডিয়ান*-এ ৮ আগস্ট। *উই হ্যাভ আউস্টেড দিস রিজিম অ্যান্ড উইল ডু সো অ্যাগেইন : দ্য স্টুডেন্টস ব্রিঙিং চেইঞ্জ টু বাংলাদেশ* শিরোনামের এই প্রতিবেদনটি লিখেছেন কামিল আহমেদ ও রেদওয়ান আহমেদ)

ঢাকা শহরের স্বাভাবিকতা ফেরাতে আবারও রাস্তায় নেমে এসেছে শিক্ষার্থীরা। তবে এবার আর বিক্ষোভ নয়; বরং গত কয়েক দিনে নাটকীয় পরিবর্তনের পর এবার অন্য কাজে মনোযোগী ছাত্ররা।

সোমবার পদত্যাগ করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। এরপর থেকে লুটতরাজ ও বিক্ষিপ্ত সংঘর্ষ ছড়িয়ে পড়ে দেশজুড়ে। বিষয়টি নিয়ে তীব্র উদ্‌বেগের সৃষ্টি হয়। খবর পাওয়া যাচ্ছে সদ্য ক্ষমতাচ্যুত আওয়ামী লীগের দলীয় অফিস এবং সংখ্যালঘুদের বাড়িঘর ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে হামলা চালানো হচ্ছে। শহরের মিরপুর এলাকার ধ্বংসস্তূপে পরিণত হওয়া একটি পুলিশ বক্সের কাচ ও অন্যান্য জিনিস সরাতে সরাতে এক স্বেচ্ছাসেবক বলছিলেন—'আমরা একটা অস্বাভাবিক সময়ের মধ্যে আছি। বিক্ষোভ থেকে অনিচ্ছাকৃত পরিস্থিতিও তৈরি হয়ে যায়। তবে তার একটা কারণ ছিল। এখন আমাদের দায়িত্ব হলো—সবকিছু স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনা। আমরা সেই কাজটিই করছি।'

কোনো ট্রাফিক পোস্টে পুলিশ কর্মকর্তাদের দেখা মিলছে না। ঢাকার জঘন্য ট্রাফিকব্যবস্থা সামাল দেওয়ার দায়িত্বও এখন ছাত্রদেরই। হাতে লেখা সাইন নিয়ে রাস্তায় দাঁড়াচ্ছে তারা। লেখা আছে—'থামুন! ট্রাফিক আইন মেনে চলুন।' পথচারীদের ফুটপাত দিয়ে চলতে উৎসাহিত করছে তারা। উৎসাহ দেওয়া হচ্ছে ফুটওভার ব্রিজ ব্যবহারে এবং হেলমেট পরতেও।

১৯ বছর বয়সি ফাইজা বলছিলেন—'আমাদের বিক্ষোভ হয়তো শেষ হয়েছে, তবে দেশের প্রতি দায়িত্ব শেষ হয়নি।'

ছাত্ররা তাদের আন্দোলনের ঐক্য ধরে রাখতে চায়। এই ঐক্যই তাদেরকে দেশবাসীর আপনজন করে তুলেছে। বিক্ষোভের দিনগুলোতে এ কারণেই ব্যাপক জনসমর্থন পেয়েছে তারা। দেশের সবচেয়ে বড়ো পরিবর্তন নিয়ে এসেছে জেন-জি।

২২ বছর বয়সি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী আশিন রায় বলেন—'একদম শুরু থেকে আমি ছিলাম। কোটা আইন আমাদের অধিকার পরিপন্থি। এটা অযৌক্তিক। ছাত্ররা নিজ যোগ্যতায় চাকরি করবে।'

তিনি আরও বলেন—'আমাদের খুব ভালো লাগছে। সবাই আমাদের সমর্থন করেছে। চূড়ান্ত বিজয় হয়েছে গণতন্ত্রের। আমরা এমনভাবে উদ্‌যাপন করেছি, যেন আমরা একাত্তরের মতোই বিজয়ী হয়েছি। তবে এখন ভয় হচ্ছে, আমাদের দেশের পরিস্থিতি বেশ খারাপ। সংখ্যালঘুরা নির্যাতনের শিকার হতে পারে। আমি চাই, এখুনি নির্বাচনের আয়োজন করা হোক। যেন মানুষ তাদের পছন্দের নেতাকে বেছে নিতে পারে। যিনি সত্যিকার অর্থেই আমাদের জন্য কাজ করতে পারবে।'

কয়েক সপ্তাহ ধরে চলা বিক্ষোভ দমনে সরকার কঠোর ব্যবস্থা নিলে তিন শতাধিক মানুষের মৃত্যু হয়। সোমবার সেনাবাহিনী দায়িত্ব গ্রহণ করে। সেনাবাহিনী প্রেসিডেন্টের বাসভবনে যে বৈঠকের আয়োজন করে, তাতে শিক্ষার্থীদের প্রতিনিধিত্বও ছিল। ছাত্রদের সব দাবি মেনে নিয়েছে সেনাবাহিনী। এর মধ্যে নোবেলজয়ী ৮৪ বছর বয়সি ড. মুহাম্মদ ইউনূসকে প্রধান উপদেষ্টা নিয়োগের দাবিও রয়েছে। তবে মুহাম্মদ ইউনূসের দেশে আসার অপেক্ষা উদ্‌বেগ বাড়াচ্ছে। তিনি এসে দায়িত্ব নিলে রাজনৈতিক ব্যবস্থায় পরিবর্তন আসবে বলে আশা করা হচ্ছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৫ বছর বয়সি শিক্ষার্থী তামান্না ইসলাম বলেন—'সেনাসমর্থিত অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের ওপর আমার একদম আস্থা নেই। আমি সেনাবাহিনীকে বিশ্বাস করি না। বিপ্লবের কারণে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার আসতে পারে, সেটাকে সমর্থন করা যায়; তবে তা সেনাবাহিনী-নিয়ন্ত্রিত হতে পারবে না।'

তিনি বলেন—'ছাত্ররা শৃঙ্খলা বজায় রাখার চেষ্টা করছে। হিন্দুসহ দেশের সংখ্যালঘুদের রক্ষায় এলাকায় এলাকায় পৃথক গ্রুপ গঠন করা হচ্ছে। তবে তারা দ্রুতই পড়াশোনায় ফিরতে চায়।'

তিনি আরও বলেন—'আমরা পুরোনো, দুর্নীতিবাজ রাজনৈতিক দল ও ধর্মীয় চরমপন্থিদের প্রত্যাখ্যান করি। আমরা আশা করি, বর্তমান দলগুলো বিষয়টি বুঝতে পারবে। তাদের দুর্নীতিগ্রস্ত ব্যবস্থা আর চলবে না। আমাদের দেশের সম্ভাবনা অসীম। অযোগ্য নেতৃত্বের কারণে সেই সম্ভাবনা আমরা নষ্ট করতে পারি না।'

শিক্ষার্থীরা বলেন—'আমরা এই সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করেছি। নতুন সরকার যদি আমাদের প্রত্যাশা পূরণে ব্যর্থ হয়, তাহলে আবার একই কাজ করব। আমি আশা করি, অতীতের ভুলত্রুটি এড়াতে ভবিষ্যতে দলগুলো ছাত্র ও সুশীল সমাজকে পাশে নিয়ে পথ চলবে।'

মুক্তিযোদ্ধাদের উত্তরাধিকারীদের সরকারি চাকরিতে এক-তৃতীয়াংশ বরাদ্দ দিয়ে কোটা আইন সংস্কারের পর জুলাই মাসের গোড়াতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা আন্দোলন শুরু করে। অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরাও তাদের সঙ্গে যোগ দেয়। সরকার তাদের দমন করতে দ্রুতই কঠোর ব্যবস্থা নিতে শুরু করে। ছাত্রনেতাদের গ্রেফতার করা হয়। ইন্টারনেট বন্ধ করে দেওয়া হয়। পুলিশ ও আওয়ামী লীগের ছাত্রসংগঠন ছাত্রলীগকে অস্ত্রসহ মাঠে নামিয়ে দেওয়া হয় ছাত্রদের আন্দোলন দমন করার জন্য। প্রায় ৩০০ মানুষ এই আন্দোলনে নিহত হয়, যা দেশজুড়ে ক্ষোভের জন্ম দেয়। সারা দেশের মানুষ নেমে আসে বিক্ষোভে।

এনজিও আমল ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতা ৩৫ বছর বয়সি ইসরাত করিম বলেন—'শিক্ষার্থীদের বিরুদ্ধে সহিংসতা আমার হৃদয় বিদীর্ণ করেছে। এই আন্দোলনে যোগ দেওয়া যে কেউ একই কথা বলবে। আমি সর্বস্তরের মানুষকে দেখেছি। রাস্তার ফকির থেকে শুরু করে শিল্পপতি সবাই রাস্তায় নেমে এসে এই আন্দোলনের প্রতি সংহতি প্রদর্শন করেছে। যার মধ্যে সামান্য বিবেক রয়েছে, সে এ ধরনের হত্যাকাণ্ডকে সমর্থন করতে পারে না।'

তিনি বলেন—'ছাত্রদের এই আন্দোলন আমাকে বাংলাদেশের ভবিষ্যতের ব্যাপারে আশাবাদী করেছে। আমি গর্বিত এই ভাবনা থেকে যে, একদিন এরাই এ দেশকে নেতৃত্ব দেবে।'

তিনি আরও বলেন—‘তরুণদের যে সাহস, মর্যাদাবোধ, বিবেকবোধ—আমি তাদের শ্রদ্ধা করি। মানুষ জেন-জি-র ব্যাপারে বাজে কথা ভাবতেই বেশি অভ্যস্ত। সবাই তাদের আত্মকেন্দ্রিক বলে থাকে। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে, তারা দানশীল, সচেতন ও সাহসী। তারাই এই সরকারকে উৎখাত করেছে। এমন কিছু নেই, যা তারা করতে পারে না।’

সুশাসনের জন্য নাগরিক সুজনের প্রতিষ্ঠাতা বদিউল আলম মজুমদার (৭৮) এই ছাত্রদের ‘হিরো’ হিসেবে অভিহিত করেন। তিনি ব্রিটিশ আমল থেকে পাকিস্তান এবং পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশ হতে দেখেছেন। স্বাধীন বাংলাদেশের আশির দশকের আন্দোলনও দেখেছেন। একাত্তরের স্বাধীনতা যুদ্ধকেও সমর্থন করেন তিনি। আর এবারের আন্দোলনটি ছিল তার দৃষ্টিতে ‘নতুন স্বাধীনতা’।

তিনি বলেন—‘আমরা বড়ো মূল্য দিয়েছি। আশা করি, এখন যারা দায়িত্ব নেবেন, তারা জনগণের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করবেন না।’

হাসিনার বছরের পর বছর স্বৈরশাসনের ফলাফল হচ্ছে এই বিক্ষোভ। বদিউল আলম মজুমদার বলেন—‘আমরা বিস্ফোরকের ওপর বসে ছিলাম। এতে আগুন ধরে যেতে পারত যেকোনো সময়ে। এটা আরও দেরিও হতে পারত। মানুষ অত্যন্ত ক্ষুব্ধ ছিল, অসন্তুষ্ট ছিল। এই কোটা হিমশৈলের সেই চূড়া, যা টাইটানিককে ডুবিয়ে দিয়েছিল।’

বাংলাদেশের লৌহমানবীর পতন

FOREIGN AFFAIRS

(*ফরেন অ্যাফেয়ার্স*-এ ৬ আগস্ট, ২০২৪ তারিখে আলী রিয়াজের লেখা এই নিবন্ধ প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল, *রিমার্কেবল ডাউনফল অব বাংলাদেশ'স আয়রন লেডি*)

বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তার দেড় দশকের টানা শাসনের অবসান ঘটিয়ে ৫ আগস্ট, ২০২৪ পদত্যাগ করে দেশ ছেড়ে পালিয়ে গেছেন। মাত্র কয়েক সপ্তাহ আগেও এটি ছিল অকল্পনীয় বিষয়। দেশজুড়ে জনতার বিক্ষোভের পরিপ্রেক্ষিতে নিরাপত্তা উদ্‌বেগ থেকে সেনাবাহিনী হাসিনাকে পদত্যাগের অনুরোধ জানায়। বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ক্ষমতা দখলের বেশ কয়েকটি নজির রয়েছে।

অবশেষে বিক্ষুব্ধ জনতা শেখ হাসিনার বাসভবনে ঢুকে পড়ে। তার ব্যবহার্য সামগ্রী, আসবাবের সঙ্গে ছবি তুলে সামাজিক মাধ্যমে পোস্ট দেয়। লুটও করে। এখনকার খবর হলো—সেনাপ্রধান ওয়াকার-উজ-জামান দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। তিনি অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠন করে একটি নির্বাচনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। তবে এ ধরনের সরকার কত দিনের জন্য ক্ষমতা নেবে তা অনিশ্চিত।

হাসিনার পতনের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের ইতিহাসে উত্থান-পতনের একটি অধ্যায়ের অবসান ঘটল। সাম্প্রতিক দশকগুলোতে দেশটি উন্নয়ন ও বিশ্বায়নের পোস্টারে পরিণত হয়েছে। দেশটির অর্থনীতি বিকশিত হচ্ছিল, মাথাপিছু আয় বাড়ছিল এবং বিভিন্ন সামাজিক খাতের সূচকগুলো এগিয়ে যাচ্ছিল ইতিবাচকভাবে। তবে এসব সুখবরের সঙ্গে সঙ্গে বেশ কিছু দুর্বলতাও ছিল। এর মধ্যে রয়েছে অর্থনৈতিক বৈষম্য, তরুণদের মধ্যে উচ্চহারে বেকারত্ব এবং হাসিনা ও তার দল আওয়ামী লীগের অধীনে একটি স্বৈরাচারী দলের শাসন। সরকার ও অর্থনীতি নিয়ে তীব্র অসন্তোষের কারণেই জুলাই মাসের গোড়ার

দিকে ঢাকায় বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে। এরপর তা দাবানলের মতো ছড়ায় পুরো দেশে। অতীতের মতো এই বিক্ষোভকেও হাসিনা কঠোরভাবে দমনের চেষ্টা করেন। মাত্র কয়েক সপ্তাহের মধ্যে কয়েকশ মানুষকে হত্যা করে নিরাপত্তা বাহিনী। বিক্ষোভকারীদের পরিচয়হীন লাশ সংগ্রহের জন্য নিযুক্ত করা হয় দাতব্য সংস্থাগুলোকে। আগস্টের শুরুতে আবারও বিক্ষোভকারীদের ওপর শক্তিপ্রয়োগ করে সরকার। একদিনে নিহত হয় ৯০ জন। শুকনো খড়ে আগুন লাগানোর কাজটি হয়ে যায় এখানেই। বিক্ষুব্ধ জনতা এবার বলল—যথেষ্ট হয়েছে। প্লাবনের মতো রাস্তায় নেমে আসে সাধারণ মানুষ। শেষ পর্যন্ত হাসিনা সামরিক হেলিকপ্টারে চড়ে ভারতে পালিয়ে যেতে বাধ্য হন।

বাংলাদেশের রাজনীতির শেষ কয়েকটি দিন বহু বছর বিশেষজ্ঞদের চিন্তার খোরাক জোগাবে। বাস্তবতা হচ্ছে, হাসিনা সরকারের বহু বছরের শক্ত ভিত্তি ও স্বৈরশাসন মাত্র কয়েক ঘণ্টার মধ্যে ভেঙে পড়ে। হাসিনার পালিয়ে যাওয়া তার বাবার ব্যক্তিত্বকেও অনেকাংশে নষ্ট করে দেয়। যে ব্যক্তিত্বের অনেকাংশই হাসিনার নিজের তৈরি করে দেওয়া। হাসিনা বরাবরই দাবি করেন, এ দেশের প্রতিষ্ঠাতা তার বাবা। ৫ আগস্টের ঘটনাপ্রবাহের পর হাসিনার তৈরি তার বাবার নামে জাদুঘর পুড়িয়ে দেওয়া হয়। তবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, হাসিনার পতন এমন একটি শক্তির কাছে হয়েছে, যাদেরকে আগে কখনও বাংলাদেশের রাজনীতির দৃশ্যপটে খুব একটা দেখা যায়নি। রাজনৈতিক দলের সংযোগমুক্ত তৃণমূল পর্যায়ের আন্দোলনের কারণে ক্ষমতাচ্যুত হন হাসিনা। এই শক্তি দেশকে নতুন একটি রাজনৈতিক চিত্র উপহার দিয়েছে। একজন স্বৈরশাসককে প্রকৃত জনগণের ক্ষমতা দিয়েই ফেলে দেওয়া সম্ভব—এই কথাটিই আবারও প্রমাণিত হয়েছে। তবে এমন জনপ্রিয় অভ্যুত্থানও জন্ম দিয়েছে কিছু অনিশ্চয়তার। হাসিনার পতন উদ্‌যাপন করছে বাংলাদেশিরা। তবে ভবিষ্যৎ নিয়েও তাদের মধ্যে হয়তো কিছু উদ্‌বেগ রয়েছে।

একটি প্রেসার কুকার

দেশের ক্যারিশমাটিক জাতীয়তাবাদী নেতা শেখ মুজিবুর রহমানের কন্যা শেখ হাসিনা। মুজিবের নেতৃত্বে ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তানকে পরাজিত করে বাংলাদেশ। পতনের আগ পর্যন্ত হাসিনাই ছিলেন বিশ্বের সবচেয়ে দীর্ঘমেয়াদি

নারী রাষ্ট্রনায়ক। *টাইম* ও *ফোর্বস* তাকে দফায় দফায় বিশ্বের সবচেয়ে ক্ষমতাশালী নারীদের তালিকায় রাখে। *দি ইকোনমিস্ট*-এর দৃষ্টিতে তিনি ছিলেন 'এশিয়ার লৌহমানবী'। তবে এই ক্ষমতা প্রায়শই তিনি অসদুদ্দেশ্যে ব্যবহার করতেন। ২০০৯ সালে দ্বিতীয় দফায় প্রধানমন্ত্রী হন শেখ হাসিনা। এরপর থেকে গণতন্ত্র ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতার নানা সূচকে বাংলাদেশের মান নিম্নগামী হতে থাকে। গণতন্ত্রের রক্ষাকবচ হিসেবে বিবেচিত বহু প্রতিষ্ঠানকে নষ্ট করে ফেলেন তিনি। এর মধ্যে রয়েছে স্বাধীন বিচার বিভাগ, সুশীল সমাজ এবং প্রেস। বাংলাদেশের বিরোধী দল ও তরুণরা হাসিনার এসব পদক্ষেপ নস্যাতের চেষ্টা করেছে বহুবার। তবে সবধরনের বিক্ষোভই কঠোর হাতে দমন করে হাসিনা সরকার।

হাসিনার ক্রমবর্ধমান কর্তৃত্বপরায়ণ মনোভাব দেশের অর্থনীতির জন্যও বড়ো সংকট হয়ে দাঁড়ায়। গত দশকে অর্থনৈতিকভাবে বাংলাদেশ অনেকটাই এগিয়ে যাচ্ছিল। বাংলাদেশকে একটি সাফল্যের গল্প বলেই অভিহিত করা হতো। তবে বহু অর্থনীতিবিদই এখন সরকারের দেওয়া পরিসংখ্যানগুলোর সত্যতা নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন। তা ছাড়া যে ধরনের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিই দেশ অর্জন করুক না কেন, এর সুবিধাভোগী হয়েছে ওপর তলার সুনির্দিষ্ট কিছু মানুষ। দেশের মোট আয়ের ৪১ শতাংশই যায় ১০ শতাংশ বাংলাদেশির পকেটে।

জুলাই মাসের অভ্যুত্থান গণ-অসন্তোষের দুটি ধারাকে মিলিয়ে দেয়। প্রথমটি হচ্ছে কোটাপ্রথা নিয়ে শিক্ষার্থীদের ক্ষোভ। সরকারি চাকরির ৫৬ শতাংশই বরাদ্দ করা হয় কোটার মাধ্যমে। যার মধ্যে ৩০ শতাংশ মুক্তিযোদ্ধাদের উত্তরাধিকারীদের জন্য নির্দিষ্ট করে রাখা। ২০১৮ সালে কয়েক মাস বিক্ষোভের পর এই ব্যবস্থা বাতিল করেন শেখ হাসিনা। সেটাই গত জুনে আবার বহাল করে হাইকোর্ট। ফলে বিক্ষুব্ধ শিক্ষার্থীরা আবারও রাস্তায় নামে। হাসিনা এসব শিক্ষার্থীকে 'রাজাকার' বলে অভিহিত করলে বিক্ষোভ আরও জোরালো হয়। বাংলাদেশে 'রাজাকার' অত্যন্ত ঘৃণিত একটি শব্দ। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানের সেনাবাহিনীকে সহায়তাকারী বাঙালিদের রাজাকার বলা হয়। হাসিনার এ মন্তব্য শিক্ষার্থীদের দেশপ্রেমকে প্রশ্নবিদ্ধ করে। শিক্ষার্থীদের ক্ষোভে ঘি ঢেলে দেয় এ মন্তব্য। আরও বেশি সংখ্যায় শিক্ষার্থী রাস্তায় নেমে আসে। তাদের জন্য কোটা হিমশৈলের চূড়া ছিল মাত্র। কোটাকে বিবেচনা করা হচ্ছিল তাদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে থাকা একটি ব্যবস্থার প্রতীক হিসেবে। ২০১০

সালের তুলনায় তরুণদের মধ্যে বেকারত্বের হার দ্বিগুণ হয়ে গেছে, যা ১৫ শতাংশেরও বেশি। ১৫-২৪ বছর বয়সি ৪০ শতাংশেরও বেশি বাংলাদেশি লেখাপড়া করে না। তারা চাকরির জন্য কোনো প্রশিক্ষণও গ্রহণ করে না। এই বাস্তবতা লাখো মানুষকে আন্দোলনে যোগ দিতে উদ্‌বুদ্ধ করে। এই বিক্ষোভ দমন করতে পুলিশ এবং ক্ষমতাসীন দলের ছাত্রসংগঠন শিক্ষার্থীদের ওপর নিষ্ঠুরভাবে হামলা চালায়। তাদের এ আচরণ পরিস্থিতিকে আরও অবনতির দিকে ঠেলে দেয়।

লাখো সাধারণ মানুষের বিক্ষোভে শামিল হওয়ার দ্বিতীয় কারণ অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অধিকারহীনতা। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে নিত্যপণ্যের মূল্য অনেক বেড়ে গেছে। বিদ্যুতের দামও বেড়েছে দফায় দফায়। এগুলো সাধারণ বাংলাদেশিদের কষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। পাশাপাশি সরকারি কর্মচারীদের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ছড়িয়ে গিয়েছিল দুর্নীতি। সাধারণ মানুষ যেখানে ধুঁকছে, সেখানে সরকার একের পর এক বিলাসবহুল অবকাঠামোগত প্রকল্পে বিনিয়োগ করে চলেছিল। বিশ্বব্যাংকসহ বাংলাদেশি ও আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষকরা মনে করেন, এই মেগা প্রকল্পগুলোতে দুর্নীতির পরিমাণও অত্যন্ত বেশি। প্রাথমিকভাবে এগুলোতে খরচের যে ধারণা দেওয়া হতো, প্রকল্প শেষে দেখা যেত খরচ হয়েছে তার কয়েক গুণ বেশি। উদাহরণ হিসেবে ঢাকার দক্ষিণ-পূর্বের পদ্মা সেতুর কথা ধরা যেতে পারে। এর খরচ প্রাথমিক হিসাবের তুলনায় দ্বিগুণ বেশি হয়। একই সঙ্গে ক্রমবর্ধমান মূল্যস্ফীতির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে হাঁপিয়ে উঠেছিল জনগণ। এর আগে শেষবার অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় সম্ভবত ২০০৮ সালে। এরপর থেকে হাসিনা ও তার সহযোগীরা নানা উপায় বের করে তাদের দল আওয়ামী লীগকেই ক্ষমতায় টিকিয়ে রাখে। গত এক দশকে অনুষ্ঠিত এসব নির্বাচনে স্থানীয় ও বিদেশি পর্যবেক্ষকরা বহু অনিয়মের সন্ধান পায়।

কর্তৃপক্ষ নিষ্ঠুর দমন-পীড়নের মাধ্যমে ক্ষমতায় টিকে ছিল। কোটাব্যবস্থা নিয়ে আন্দোলনকারী নেতাদের সরকার আটক করে নির্যাতন চালায় বলে অভিযোগ করে স্থানীয় সংবাদমাধ্যম। আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংগঠনগুলোর দেওয়া তথ্যমতে, পুলিশ ও আধাসামরিক বাহিনীর সদস্যরা আন্দোলন দমন করতে AK-47 অ্যাসল্ট রাইফেলও ব্যবহার করে, যা জেনেভা চুক্তির সম্পূর্ণ পরিপন্থি। বাংলাদেশ এই চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী রাষ্ট্র। সরকার একপর্যায়ে দিনের

বেলা কারফিউ শিথিল করে আন্তঃনগর যোগাযোগব্যবস্থা চালু করে দেয়। তবে তাতে এ কথা ঢাকা পড়ে না যে, বাংলাদেশ একটি ভয়াবহ ম্যাসাকারের সাক্ষী হয়ে রয়েছে।

ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়া এই আন্দোলনে বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোর ভূমিকা ছিল গৌন। যদিও হাসিনা বরাবরের মতোই যেকোনো আন্দোলনের কারণ হিসেবে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল ও জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশকে দায়ী করেন। তিনি দাবি করেন, এই দলগুলোর সন্ত্রাসের কারণেই সহিংস ঘটনা ঘটেছে। এই দোষারোপের মধ্যে দিয়ে হাসিনা একটি স্পষ্ট বার্তা দেন, এই লড়াই দেশকে ইসলামপন্থিদের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য। পশ্চিমারা চাইলে হাসিনার সঙ্গে থাকতে পারেন অথবা সাইডলাইনে বসে হাসিনার নেওয়া ব্যবস্থাগুলো প্রত্যক্ষ করতে পারেন। তবে হাসিনার এই চাল বাংলাদেশি বা দেশটির মিত্রদের কাউকেই বোকা বানাতে পারেনি।

এক স্বৈরাচারীর পতন

হাসিনার পতনের সূত্রপাত হয় ৩ আগস্ট থেকে। ওই দিন ছাত্রবিক্ষোভে সমাজের সর্বস্তরের মানুষ যোগ দেয়। এই বিক্ষোভ মিছিল থেকে স্পষ্ট হয়ে যায়, কয়েক সপ্তাহ ধরে চলা বিক্ষোভে কয়েকশ মানুষের মৃত্যু হলেও সরকার এ আন্দোলন দমনে সফল হয়নি। শুরুর দিকে তিনি বা তার দলের নেতারা ছাত্রদের দাবিকে খুব একটা গুরুত্ব দেননি। তার আশা ছিল, তার ছাত্রসংগঠন এবং পুলিশ মিলে এ আন্দোলন দমন করে ফেলবে। তবে কয়েক সপ্তাহের নিষ্ঠুরতার পর ছাত্ররা ঢাকামুখী মার্চের কর্মসূচি দেয়। এই মার্চেই হাজারো মানুষ ঢাকায় ঢুকে পড়ে এবং হাসিনা পালিয়ে যেতে বাধ্য হন।

যে গতিতে দীর্ঘদিনের শাসক হাসিনা পদত্যাগ করে নির্বাসিত জীবন বেছে নিয়েছেন, তা এককথায় অবিশ্বাস্য। এর থেকে বোঝা যায়, তার শাসন খুবই ভঙ্গুর ছিল। আমলাতন্ত্র ও সেনাবাহিনী মিলেও এই সরকারকে টিকিয়ে রাখতে পারেনি। এসব সুবিধাভোগী মানুষ শেষ পর্যায়ে গিয়ে সরকারকে দেওয়া তাদের প্রতিশ্রুতির কথা ভুলে যায় বা ওই প্রতিশ্রুতি দুর্বল হয়ে পড়ে। বহু বছর ধরেই দেশের ক্ষমতাসীনরা জনবিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। তারা পুরোপুরি

রাষ্ট্রের কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের ওপর নির্ভরশীল হয়ে ওঠে। তাদের পক্ষে গণ-অভ্যুত্থানের শক্তি ও চ্যালেঞ্জ বুঝে ওঠা সম্ভব হয়নি। ওই প্রতিষ্ঠানগুলোও হুমকির মুখে পড়ে।

হাসিনা শুধু তার নিজের ভাবমূর্তিকেই নষ্ট করেননি; তার বাবার মর্যাদাকেও ভূলুণ্ঠিত করেছেন, যা বহু বছর ধরে সযত্নে তিনি নিজেই তৈরি করেছেন। তার আর কোনো অস্তিত্ব থাকল না বললেই চলে। মুজিব ১৯৭৫ সালে এক সামরিক অভ্যুত্থানে নিহত হন। হাসিনা তার বাবার ভাবমূর্তি মানুষের মনে অমর করে রাখতে চেয়েছিলেন। হাসিনার শাসন এবং তার দলকেও উচ্চমর্যাদায় আসীন করতে চেয়েছিলেন তিনি। তবে হাসিনার এভাবে পালিয়ে যাওয়ার পর বাংলাদেশের রাজনীতিতে তার বা তার বাবার বা তাদের দলের আর সেই আসন ধরে রাখার সুযোগ রইল না।

হাসিনার পতন যেভাবে হলো, সেটাই সবচেয়ে লক্ষণীয়। বাংলাদেশে রাজনৈতিক উত্থান-পতন বা গণবিক্ষোভ নতুন কিছু নয়। সাম্প্রতিক দশকগুলোতে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে রাজনৈতিক দলগুলোর কাজ হচ্ছে পরস্পরের বিরুদ্ধে লেগে থাকা। বিশেষ করে আওয়ামী লীগ ও বিএনপি এ কাজে অগ্রসর। সেই ধারা কিন্তু এবারের বিক্ষোভে দৃশ্যমান ছিল না। তার পরিবর্তে তৃণমূল থেকে উঠে আসা তরুণদের একটি আন্দোলন বাংলাদেশের রাজনৈতিক দৃশ্যপটে চিত্রিত হয়। লাখো মানুষ সরকারের বিরুদ্ধে রাস্তায় নেমে আসে। এ পরিমাণ জনসমাগমের আয়োজন কোনো রাজনৈতিক দলের পক্ষে করা সম্ভব হতো না। হাসিনার পতন একটি ঐতিহাসিক মুহূর্ত। এটা প্রমাণ করে যে, গণ-অসন্তোষ তৈরি হলে কোনো শাসকের পক্ষেই ক্ষমতায় টিকে থাকা সম্ভব নয়।

তবে হাসিনার পতনের পরও উদ্‌বিগ্ন হওয়ার মতো বেশ কয়েকটি কারণ রয়েছে। ২০০৭ থেকে ২০০৮ সাল পর্যন্ত অন্তর্বর্তী সরকারের দায়িত্ব অত্যন্ত কার্যকরভাবে পালন করে সামরিক বাহিনী। এবারেরটি বাংলাদেশিদের সবচেয়ে ভালো সুযোগ। রাষ্ট্র এই সুযোগ নেবে, সে আশা করা যেতেই পারে। জবাবদিহিতার সঙ্গে স্বার্থগত দ্বন্দ্বের বিরোধ নতুন কিছু নয়। সামরিক বাহিনী অনেকটা স্থিতিশীলতা বজায় রেখে সংস্কার করার পক্ষপাতী। তারা হয়তো খুব বড়ো পর্যায়ের সংস্কার চায় না। তবে বড়ো ধরনের সংস্কার করা সম্ভব না হলে বাংলাদেশ হয়তো আগামী কয়েক বছরের মধ্যে আবার সেই পুরোনো জায়গাতেই ফিরে যাবে।

আগামী কয়েক মাসের মধ্যেই সেনাবাহিনী হয়তো নির্বাচনের আয়োজন করবে। ক্ষমতায় আসবে নতুন একটি গণতান্ত্রিক সরকার। তবে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আনা সম্ভব না হলে আবার অতীতের গাড়িতেই উঠে বসবে বাংলাদেশ। যে শক্তি হাসিনার পতন ঘটিয়েছে তার সমস্যা হলো—এটি একটি নতুন ধরনের রাজনৈতিক ব্যবস্থার আহ্বান জানানো ছাড়া ভবিষ্যতের ব্যাপারে সুস্পষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি করতে পারেনি। বাংলাদেশের গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করার জন্য (সম্ভবত সাংবিধানিক সংস্কারের মাধ্যমে) দৃঢ় নেতৃত্বের প্রয়োজন। গণ-আন্দোলনের শক্তিগুলো নষ্ট হয়ে যেতে পারে। দেশকে প্রয়োজনীয় পরিবর্তনের দিকে পরিচালিত করতে ব্যর্থ হতে পারে। বীরত্বপূর্ণ প্রচেষ্টায় বাংলাদেশিরা হাসিনা সরকারের পতন ঘটিয়েছে। কিন্তু এখন ধ্বংসস্তূপ থেকে কি বের হতে পারবে?

YOU CAN JAIL A REVOLUTIONARY
BUT YOU CANT JAIL A REVOLUTION

বাংলাদেশ : একটি রাজবংশের পতন

Le Monde

(*লা মঁদ*-এ ৭ আগস্ট *বাংলাদেশ : দ্য ফল অব অ্যা ডাইনেস্টি* শিরোনামে ব্রুনো ফিলিপের লেখা এই প্রতিবেদনটি প্রকাশিত হয়।)

বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মঙ্গলবার, ৫ আগস্ট দেশ ছেড়ে পালিয়ে গেছেন। অনেকগুলো পরিচয় এই লৌহমানবীর। তিনি পাকিস্তান থেকে দেশ স্বাধীন করার আন্দোলনে নেতৃত্বদানকারী ব্যক্তির কন্যা, দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লড়াই করা নেতা, একসময় অতিরিক্ত জনসংখ্যার চাপে দারিদ্র্যের ভারে ন্যুব্জ দেশটিতে অর্থনীতির বিকাশ ঘটানোর নায়ক এবং সর্বশেষ চরম স্বৈরাচারী এক দাম্ভিক নেতা। একসময় তার নামের সামনে প্রশংসাসূচক যেসব বিশেষণ ব্যবহার করা হতো, সেগুলোই নেতিবাচক কর্মকাণ্ডের জন্য কলঙ্ক হয়ে সামনে এসে দাঁড়ায়। পদত্যাগ করার পর তার নামের সামনে বসানো সবচেয়ে বেশি ব্যবহার করা শব্দটি হলো 'স্বৈরাচার'। এ যেন স্বর্গ থেকে নক্ষত্রের পতন।

১৫ বছর ক্ষমতাসীন ছিলেন তিনি। গত জানুয়ারিতে অনুষ্ঠিত নির্বাচনের মধ্যে দিয়ে তার চতুর্থ মেয়াদ শুরু হয়। এর আগেও ১৯৯৬-২০০১ সাল পর্যন্ত এই দায়িত্ব তিনি পালন করেন। যদিও ৭৬ বছর বয়সি এই 'লৌহমানবী' পদত্যাগের পর হেলিকপ্টারে করে প্রতিবেশী দেশ ভারতে পালিয়ে যাওয়ার সময় নিত্যপ্রয়োজনীয় ব্যবহার্য জিনিসপত্র গোছানোরও ফুরসত পাননি। পুলিশপ্রধান তাকে সতর্ক করে জানায়, লাখো বিক্ষোভকারী তার বাড়ির দিকে এগিয়ে আসছে। তিন সপ্তাহেরও বেশি সময় ধরে চলা ছাত্রবিক্ষোভে পুলিশ যে নৃশংসতা দেখিয়েছে, তার প্রতিশোধ নিতে মুখিয়ে আছে বিক্ষোভকারীরা। ওই ছাত্রবিক্ষোভে চারশোরও বেশি মানুষ নিহত হয়।

পদত্যাগের বক্তব্য লেখারও সময় পাননি তিনি। সহিংসতার আগুনে পুড়তে থাকা শহরে কেউ তার নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পারেনি। তার পালিয়ে যাওয়ার কয়েক ঘণ্টা পর বাংলাদেশের সেনাপ্রধান ঘোষণা করেন, তিনি অন্তর্বর্তী সরকার গঠন প্রক্রিয়ার ওপর নজর রাখবেন।

স্বাধীনতার পর বাংলাদেশের ৫৩ বছরের ইতিহাসে সেনাবাহিনী ক্ষমতায় থাক বা না থাক, তাদের একটা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রভাব সবসময়ই ছিল। জেনারেলরা ঠিক কীভাবে পদক্ষেপ নিতে যাচ্ছে, সে ব্যাপারে নিশ্চিতভাবে কিছু বলা কারও পক্ষেই সম্ভব নয়। এবার তারা কার্যত আবার ক্ষমতায় এলো। যদিও সম্ভাব্য সব উপায়ে তারা দেখাতে চাইছে, তারা অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ক্ষমতায় ফেরেনি।

ভূ-রাজনৈতিক অসংগতি

সাবেক পূর্ববঙ্গে রাজনৈতিক সহিংসতা একটি অতিসাধারণ বিষয়। বাংলাদেশের জন্ম হয় ১৯৭১ সালে। পাকিস্তান থেকে দেশটির স্বাধীনতা ছিনিয়ে আনার গল্পও রক্তস্নাত। এর আগে ১৯৪৭ সালে ব্রিটিশ ঔপনিবেশ থেকে জন্ম হয় পাকিস্তানের। মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষকে সুরক্ষা দিতেই পাকিস্তানের সৃষ্টি। পাকিস্তানের জন্মও ছিল ভূরাজনৈতিকভাবে অসংগতিপূর্ণ। শুরু থেকেই দুই ভাগে বিভক্ত ছিল পাকিস্তান। পশ্চিম পাকিস্তানের রাজধানী ছিল করাচি। আর পূর্ববঙ্গের ঢাকা। আর এই দুই রাজধানীর মাঝ বরাবর পুরো ভারত। দুই অঞ্চল সাংস্কৃতিক দিক থেকে পুরোপুরি আলাদা, শুধু ইসলাম ধর্মকে কেন্দ্র করে দুই অঞ্চলকে একত্রিত রাখার চেষ্টা করা হয়।

এই বৈপরীত্য স্থায়ী হয়নি। বাঙালিরা খুব দ্রুতই বুঝতে পারে পশ্চিম পাকিস্তান তাদের ওপর আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা করছে। সব ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দু ছিল পশ্চিম পাকিস্তান। এ সময় ভারতের সহায়তায় একটি অসহযোগ আন্দোলন গড়ে ওঠে। এই আন্দোলনই চূড়ান্ত পরিণতি পায় ১৯৭১ সালে। স্বাধীন হয় বাংলাদেশ। রক্তক্ষয়ী এই যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন সর্বস্তরের মানুষ—স্বাধীনতার সমর্থক, চরমপন্থি এবং সামরিক শাসক গোষ্ঠীর পুলিশ বাহিনীসহ সবার অবদান আছে বাংলাদেশের স্বাধীনতায়। এরপর ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর ১৩ দিনের ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনীর সহযোগিতা শেষে আত্মসমর্পণ করে পাকিস্তানি বাহিনী। পূর্ব-পাকিস্তান হয় বাংলাদেশ। শেখ হাসিনার বাবা শেখ মুজিবুর রহমান হন দেশের প্রথম নেতা।

তবে স্বাধীনতার পর মধুচন্দ্রিমার কাল খুব একটা দীর্ঘ হয়নি। মাত্র চার বছরের মাথায় ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট সেনাবাহিনীর কয়েকজন সদস্যের অভিযানে নিহত হন শেখ মুজিব। তার পরিবারের ১৫ সদস্য ওই রাতে প্রাণ হারান।

তার দুই কন্যা হাসিনা ও রেহানা জার্মানিতে থাকার কারণে বেঁচে যান। শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে কর্তৃত্বপরায়ণতা, বিরোধীদের কণ্ঠরোধ, গুম, দেশকে একদলীয় ব্যবস্থায় পরিণত করার অভিযোগ ছিল।

এই নৃশংস হত্যাকাণ্ড হাসিনাকে তীব্রভাবে নাড়া দেয়। পরে ১৯৯৬ সালে তিনি দেশটির প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হয়। আগে-পরে ক্ষমতায় থাকাকালীন প্রায় সবসময় তিনি তার বাবার ঘটনাকে উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। *লা মঁদ*-কে তার পারিবারিক বাসভবনে এক সাক্ষাৎকার দেওয়ার সময় শেখ হাসিনা লাইব্রেরির বইয়ে ঘাতকদের বুলেটের আঘাতের চিহ্ন দেখান। দেওয়ালে ঝোলানো ছিল নিহতদের ছবি। নিহতদের রক্তের দাগগুলো কাচ দিয়ে ঢেকে সংরক্ষণ করা হয়েছে। এসব কিছুই ওই বাড়িতে একটা ভিন্ন আবহ তৈরি করে।

ধারাবাহিক অভ্যুত্থান

৪৯ বছর বয়সে দেশের গণতন্ত্র মুক্তির লড়াইয়ে যোগ দেন শেখ হাসিনা। এর ১৪ বছর আগে দীর্ঘ নির্বাসন শেষে দেশে ফেরেন তিনি।

১৯৭৫-১৯৯০ সাল পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে নানা মাত্রার অভ্যুত্থানের মধ্যে দিয়ে যায় বাংলাদেশ। ১৯৯০ সালের ডিসেম্বরে তিন মাসের আন্দোলনের পর পতন হয় জেনারেল মুহাম্মদ এরশাদের। এই আন্দোলনে হাসিনা মুখ্য ভূমিকা পালন করেন। এরশাদ ১৯৮৩ সালে দেশের প্রেসিডেন্ট হন।

এরপরের কয়েক দশক গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত সরকারই বাংলাদেশ পরিচালনা করে। ক্ষমতায় আসেন মূলত হাসিনা এবং তার প্রতিদ্বন্দ্বী খালেদা জিয়া। খালেদা জিয়া এক নিহত জেনারেলের স্ত্রী। জেনারেল জিয়াউর রহমান দেশটির প্রেসিডেন্ট ছিলেন। এই দুই নেত্রী পরবর্তী সময় বাংলাদেশের ক্ষমতায় ছিলেন। এই দুই নারীর সম্পর্কে তীব্র দ্বন্দ্ব ছিল শুরু থেকেই। পরবর্তী সময়ে দুর্নীতির দায়ে কারাভোগও করেছেন তারা।

সম্প্রতি ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তার নিজ দোষেই চেয়ার ছাড়তে বাধ্য হয়েছেন। তার বিরুদ্ধে কর্তৃত্বপরায়ণতা, অত্যধিক নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা ও স্বজন তোষণের অভিযোগ ছিল। এসব অভিযোগের ক্ষেত্রে তার অবস্থান হুবহু তার বাবার মতোই। আর এই বাস্তবতাই ক্ষুব্ধ করে তোলে সাধারণ মানুষকে।

দেশজুড়ে নির্মিত শেখ মুজিবের ভাস্কর্য হাসিনার পদত্যাগের পর ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়। ১৯৭১-এর যুদ্ধে স্বাধীনতা লাভ, ১৯৯০-এর গণ-আন্দোলনের পর ২০২৪ সালের এই বিপ্লব এশিয়ার বংশানুক্রমিক রাজনীতির একটি শক্ত পিলারকে গুঁড়িয়ে দিলো।

বাস্তবতা হচ্ছে, স্বৈরাচারের পালিয়ে যাওয়ার পর থেকেই ঢাকাজুড়ে নৈরাজ্য চলছে। এমন একটি অবস্থার মধ্যে এই অসাধারণ বিপ্লবের ফসল কে ঘরে তুলবে তা নিশ্চিত করে বলা যাচ্ছে না। ধর্মনিরপেক্ষ ও ভারতঘনিষ্ঠ হাসিনা ইসলামপন্থিদের হুমকিকে অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন। অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান হিসেবে মঙ্গলবার ৬ আগস্ট নোবেল বিজয়ী ড. মুহাম্মদ ইউনূসকে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। একে ইতিবাচক পদক্ষেপ হিসেবেই বিবেচনা করা হচ্ছে। এখন দেশের এই নতুন কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব হবে দেশের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট হওয়া।

জাতিসংঘের মানবাধিকার দপ্তর

বাংলাদেশে সাম্প্রতিক বিক্ষোভ ও অসন্তোষের ওপর প্রাথমিক বিশ্লেষণ

(জাতিসংঘের মানবাধিকার কমিশন *প্রাইমারি অ্যানালাইসিস অব রিসেন্ট প্রটেস্টস অ্যান্ড আনরেস্ট ইন বাংলাদেশ* শীর্ষক এই প্রতিবেদন প্রকাশিত হয় ১৬ আগস্ট, ২০২৪)

বাংলাদেশে ২০২৪ সালের মধ্য জুনে সরকারি চাকরিতে কোটাব্যবস্থা পুনরায় প্রবর্তনের প্রতিবাদে প্রাথমিকভাবে শান্তিপূর্ণভাবে শুরু হয় ছাত্র আন্দোলন। তবে অল্প সময়ের মধ্যেই নিরাপত্তা বাহিনীর মানবাধিকার লঙ্ঘন ও শক্তিপ্রয়োগের কারণে আন্দোলন সহিংস হয়ে ওঠে। এতে কয়েকশ মানুষ নিহত হয়। এদের মধ্যে শিশু রয়েছে ৩২ জন। এসব ঘটনায় আহত হয়েছে হাজারো মানুষ। নিরাপত্তা বাহিনী পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে অপ্রয়োজনীয়ভাবে অতিরিক্ত শক্তিপ্রয়োগ করেছে বলে অভিযোগ রয়েছে। বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত তদন্তের প্রয়োজন। তাদের বিরুদ্ধে বিচারবহির্ভূত হত্যা, নির্বিচারে গ্রেফতার ও আটক, গুম, নির্যাতন ও বাজে ব্যবহার এবং মতপ্রকাশের স্বাধীনতা, শান্তিপূর্ণভাবে সমাবেশের অধিকার না দেওয়ারও অভিযোগ রয়েছে। বাংলাদেশে অত্যন্ত দ্রুত ও নাটকীয়ভাবে বেশ কিছু পরিবর্তন এসেছে। তীব্র আন্দোলন ও অসহযোগের পর সরকার ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট পদত্যাগ করে। তার পরিবর্তে এখন দায়িত্ব নিয়েছে একটি বেসামরিক অন্তর্বর্তীকালীন সরকার। তারাই একটি নতুন নির্বাচনের আয়োজন করবে।

অন্তর্বর্তীকালীন সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর থেকেই হাজারো বন্দি, দীর্ঘদিন থেকে আটক ও গুমের শিকার মানুষসহ রাজনৈতিক বন্দিরা মুক্তি পাচ্ছে। পুলিশের মহাপরিচালক এবং আধাসামরিক বাহিনী র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটেলিয়ানের প্রধানকে তাদের পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। নিরাপত্তা

বাহিনীতে সমন্বিত সংস্কারের প্রয়োজন। তবে লুটপাট, অগ্নিসংযোগ, সংখ্যালঘুদের ওপর হামলা এবং সাবেক ক্ষমতাসীন দল আওয়ামী লীগের সদস্যদের ওপর হামলা উদ্‌বেগের জন্ম দিয়েছে।

ক্ষমতার এই পালাবদল বাংলাদেশের জন্য গণতন্ত্র ও আইনের শাসনে ফেরার একটি দুর্লভ সুযোগ। বাংলাদেশে অবশ্য বহু ক্ষেত্রেই সংস্কারের প্রয়োজন। দেশের প্রতিষ্ঠানগুলো সংস্কার এবং পুনরুজ্জীবিত করতে হবে। মানবাধিকার পরিস্থিতিকে শক্তিশালী করতে হবে। জুলাই থেকে মানবাধিকার লঙ্ঘনের ব্যাপারে উত্থিত অভিযোগগুলোর সমন্বিত, পক্ষপাতহীন ও স্বচ্ছ তদন্ত করতে হবে। কাজটি গুরুত্বপূর্ণ। এতে করে ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসন এবং দায়ীদের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা সম্ভব হবে। পাশাপাশি এ ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তিও প্রতিরোধ করবে।

অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস এবং সেনাপ্রধান অবৈধ হত্যাকাণ্ডগুলোর তদন্ত করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। ২০২৪ সালের ৪ আগস্ট দেওয়া এক বিবৃতিতে হিউম্যান রাইটসের হাইকমিশনার বর্তমান পরিস্থিতিতে মানুষের মধ্যে আস্থা তৈরিতে স্বতন্ত্রভাবে তদন্ত হওয়া প্রয়োজন বলে তার মত ব্যক্ত করেন। তার দপ্তর থেকে এ ব্যাপারে সহযোগিতার প্রস্তাবও দেওয়া হয়।

এই প্রতিবেদনটি 'অফিস অব দ্য হাই কমিশন ফর হিউম্যান রাইটস' তৈরি করেছে। এতে বাংলাদেশে সাম্প্রতিক ঘটনাবলিতে মানবাধিকার লঙ্ঘন এবং উদ্‌বেগের প্রাথমিক পর্যবেক্ষণ উল্লেখ করা হয়েছে। একাধিক উন্মুক্ত সূত্র এবং অন্যান্য আধানিয়ন্ত্রিত সূত্র থেকে এই প্রতিবেদনের জন্য তথ্য নেওয়া হয়েছে। জুলাই থেকে ৬ আগস্ট, ২০২৪ পর্যন্ত দেশটিতে চলা বিক্ষোভ এবং রাষ্ট্রের নেওয়া ব্যবস্থা সম্পর্কে এতে তথ্য সংযুক্ত হয়েছে। ওই মেয়াদকালে ইন্টারনেট পরিষেবা প্রাপ্তিতে বিধিনিষেধ এবং মাধ্যমগুলোর সঙ্গে যোগাযোগ বিঘ্নিত হওয়ায় এই প্রতিবেদনে সমন্বিত তথ্য প্রদান সম্ভব হয়নি।

সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছে ২৩ জুলাই, ২০২৪ সালে হাইকমিশনার ফর হিউম্যান রাইটসের পাঠানো এক বার্তায় মানবাধিকার লঙ্ঘনের ব্যাপারে উদ্‌বেগ প্রকাশ করা হয়। একই সঙ্গে ওএইচসিএইচআরের অনুসন্ধানী দল বাংলাদেশে পাঠানোর প্রস্তাব দেওয়া হয়। এ বার্তার জবাবে ওই সময়ের

পররাষ্ট্রমন্ত্রী যে চিঠি পাঠান, তাতে এ প্রস্তাবের প্রসঙ্গ উল্লেখ করা হয়নি। এই প্রতিবেদনের আগের সংস্করণটি ২ আগস্ট, ২০২৪ সালে বাংলাদেশের পররাষ্ট্র দপ্তরে পাঠানো হয়। তবে তখন ওই পরিস্থিতির মধ্যে এই প্রতিবেদনের আনুষ্ঠানিক কোনো জবাব পাওয়া যায়নি। তবে তারা বাংলাদেশে গুরুত্বপূর্ণ কিছু পরিবর্তনের কথা জানিয়েছিল।

এবারের প্রতিবেদনে অন্তর্বর্তী সরকারের জন্য বেশ কিছু পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এতে বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক মানবাধিকার রক্ষার বাধ্যবাধকতার প্রতি সম্মান রেখে মানবাধিকার লঙ্ঘনকারীদের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে বলা হয়েছে। ভুক্তভোগীদের অধিকারও নিশ্চিত করতে হবে। আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের প্রতিও এতে কিছু পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এই পরামর্শগুলোতে উত্তেজনা নিরসনের কথা বলা হয়েছে। নিরাপত্তা সেক্টর এবং অন্যান্য মাধ্যমে একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি রোধে অগ্রাধিকারভিত্তিতে সংস্কার ও মানবাধিকার নীতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে একটি গণতান্ত্রিক, শান্তিপূর্ণ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক উত্তরণ নিশ্চিত করার কথা বলা হয়েছে।

বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি অন্তর্বর্তীকালীন সরকারকে অফিসিয়ালি নিয়োগ দেন। তারা ৮ আগস্ট, ২০২৪-এ শপথ গ্রহণ করেন। ৯ আগস্ট দেশের সুপ্রিমকোর্ট এক মতামতে জানায়, বর্তমানের জরুরি পরিস্থিতিতে সাংবিধানিক সংকটকালীন অবস্থায় এবং রাষ্ট্রের নির্বাহী কার্যক্রম চালু রাখার স্বার্থে রাষ্ট্রপতি অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের নিয়োগ দিতে পারেন।

পটভূমি

মুক্তিযুদ্ধ নামে পরিচিত বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের উত্তরাধিকারীদের সরকারি চাকরিতে ৩০ শতাংশ কোটার ব্যবস্থা রাখার সিদ্ধান্ত হাইকোর্ট আবারও বহাল করায় ২০২৪ সালের মধ্য জুন থেকে বাংলাদেশে ছাত্রবিক্ষোভ শুরু হয়। সে সময় ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত ছিল এটি। এর আগে ২০১৮ সালের অক্টোবরে বড়ো ধরনের বিক্ষোভের পর কোটাব্যবস্থা রদ করা হয়েছিল। তবে ২০২৪ সালে মুক্তিযোদ্ধাদের সাতজন উত্তরাধিকারী এর বিরুদ্ধে আপিল করেন। এরপরই

সিদ্ধান্ত জানায় হাইকোর্ট। এ সিদ্ধান্তের তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখায় শিক্ষার্থী ও তরুণ পেশাজীবীরা। তারা মনে করে, কোটাব্যবস্থা অত্যন্ত বৈষম্যমূলক এবং এটা নির্দিষ্টসংখ্যক রাজনৈতিক ব্যক্তিকেই সুবিধা দেবে।

শিক্ষার্থীরা তাদের আন্দোলনের নাম দেয় 'বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন'। রাজনৈতিক অস্থিরতা ও অর্থনৈতিক অসন্তোষের কারণে খুব দ্রুতই এই আন্দোলন সাড়া ফেলে। দেশজুড়ে সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের হাজারো শিক্ষার্থী এতে যোগ দেয়। উত্তেজনা বাড়তে থাকলে সরকার হাইকোর্টের রুলের বিরুদ্ধে সুপ্রিমকোর্টে আপিল করে। এই বিক্ষোভে বাংলাদেশের তরুণ সমাজের অর্থনীতি নিয়ে সুতীব্র হতাশাও প্রকাশিত হয়। দেশের বেকারত্বের হার অত্যন্ত বেশি। শিক্ষিত বহু তরুণই সুযোগের অভাবে হতাশ হয়ে পড়ে। আন্তর্জাতিক শ্রমসংস্থার (আইএলও) ২০২৩ সালের এক প্রতিবেদনে জানানো হয়, বাংলাদেশে তরুণদের মধ্যে বেকারত্বের হার ১২ দশমিক ৩ শতাংশ, যা সার্বিক বেকারত্বের হারের তিনগুণ বেশি।

আওয়ামী লীগের শাসনামলে গণতান্ত্রিক ও সামাজিক বিকাশের সুযোগ সংকুচিত হয়ে আসে। ফলে বঞ্চিত সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণের কারণে আন্দোলন আরও গতিশীল হয়। আওয়ামী লীগ সরকার বিচার বিভাগসহ সব সরকারি প্রতিষ্ঠানকে দলীয়করণ করে। তাদের সময় সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে কথা বলাও কঠিন হয়ে যায়। দেশের বাকি রাজনৈতিক দলগুলোর ইতিহাস পালটে দেয় আওয়ামী লীগ। দেশের সবধরনের সহিংসতা ও ভাঙচুরের জন্য বিরোধী দলগুলোকে দায়ী করা হয়।

আন্দোলন মূলত বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে শান্তিপূর্ণভাবে শুরু হয়। তবে মধ্য জুলাইয়ের মধ্যেই তা সহিংস রূপ নেয়। সরকারের জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তারা আন্দোলনের ব্যাপারে কটূক্তি করলে পরিস্থিতির দ্রুত অবনতি ঘটতে থাকে। আন্দোলনের একপর্যায়ে বিক্ষোভকারীদের 'রাজাকার' বলেও ডাকা হয়। বাংলাদেশে এ শব্দটি অত্যন্ত অসম্মানজনক বলে বিবেচিত। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানের সেনাদের যেসব বাঙালি সহযোগিতা করে, তাদের রাজাকার বলে ডাকা হয়। আওয়ামী লীগের মহাসচিব ওবায়দুল কাদের আন্দোলনকারীদের 'মুক্তিযুদ্ধবিরোধী শক্তি' হিসেবে অভিহিত করেন। তাদের বিরোধী দল বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) ও জামায়াতে ইসলামীর

সদস্য বলেও অভিযুক্ত করেন তিনি। একইসঙ্গে তিনি হুমকি দিয়ে বলেন—'আন্দোলনকারীদের সামাল দিতে আওয়ামী লীগের ছাত্রসংগঠন বাংলাদেশ ছাত্রলীগই যথেষ্ট।' তার মন্তব্য উত্তেজনা আরও বাড়িয়ে দেয়। ফলে সরকারের সমর্থকদের সঙ্গে বিক্ষোভকারীদের সহিংসতা চরমভাবে বেড়ে যায়।

১৫ জুলাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও ঢাকা মেডিকেল কলেজে ছাত্রদের বিক্ষোভে ছাত্রলীগ সদস্যরা হামলা চালালে সহিংসতা আরও বাড়ে। বহু বিক্ষোভকারী আহত হয়। লাঠি, লোহার রড ও আগ্নেয়াস্ত্র হাতে সাধারণ ছাত্রদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে ছাত্রলীগ। এই হামলাগুলো পুলিশ প্রতিহত করার চেষ্টা করেনি। সরকারও প্রকাশ্যে ছাত্রলীগকে এ ধরনের কাজ থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করেনি। পরদিন ১৬ জুলাই পরিস্থিতির আরও অবনতি ঘটে। রংপুরে আবু সাঈদ নামে এক ছাত্রকে গুলি করে হত্যা করে পুলিশ। আবু সাঈদ পুলিশের জন্য কোনো হুমকি ছিলেন না। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া ছবিতে দেখা যায়, নিরস্ত্র এই ছাত্র পুলিশের সামনে দু-হাত প্রসারিত করে দাঁড়িয়ে যায়। এই ঘটনা মানুষের মধ্যে ক্ষোভ আরও বাড়িয়ে দেয়। দেশজুড়ে বিক্ষোভ শুরু হয়।

সরকার এই বিক্ষোভ দমনে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ ও র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটেলিয়নের মতো আধাসামরিক বাহিনী মোতায়েন করে। এই দুই বাহিনীর বিরুদ্ধে মানবাধিকার লঙ্ঘনের গুরুতর অভিযোগ রয়েছে। অভিযোগগুলোর মধ্যে গুম, নির্যাতন, দুর্ব্যবহারও রয়েছে। এতে আরও বাড়ে বিক্ষোভ। ১৬ জুলাই সব স্কুল ও বিশ্ববিদ্যালয়সহ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ করে দেয় সরকার। ১৭ জুলাই আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করেন, সব হত্যা ও সহিংসতার ঘটনার তদন্ত করে অপরাধীদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে। সরকার হাইকোর্টের বিচারকদের সমন্বয়ে একটি বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত নেয়। তারা ১৬ জুলাই, ২০২৪ তারিখে নিহত ছয় জনের হত্যার এবং সহিংসতা, অগ্নিসংযোগ, লুটতরাজ ও সন্ত্রাসী তৎপরতার তদন্ত করবে।

সরকারি ও বেসরকারি সম্পদ ক্ষয়ক্ষতির প্রচুর প্রতিবেদন প্রকাশিত হতে শুরু করে। হাইকমিশনে ৩০ জুলাই পাঠানো সরকারি এক বার্তায় জানানো হয়, পুলিশের ২৩৫টি স্থাপনা ধ্বংস বা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এর মধ্যে ৬৯টি পুলিশ

পোস্ট পুরোপুরি ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে। মেট্রোরেল ও এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়েসহ শত শত সরকারি স্থাপনায় ভাঙচুর করা হয়েছে। ১৮ জুলাই ক্ষতিগ্রস্ত হয় সরকারি চ্যানেল বাংলাদেশ টেলিভিশন ঢাকা। আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয় এতে। সম্প্রচারের বেশ কিছু যন্ত্র ও গাড়ি পোড়ানো হয়। পরে দাঙ্গা পুলিশ গিয়ে বিক্ষোভকারীদের টেলিভিশন কেন্দ্র থেকে বের করে দেয়।

বিক্ষোভ অল্প সময়ের মধ্যেই সর্বস্তরের শিক্ষার্থীদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। ১৮ জুলাইয়ের মধ্যে শিক্ষার্থীদের আন্দোলন প্রায় সব বিরোধী রাজনৈতিক দলের সমর্থন পেয়ে যায়। এদের মধ্যে রয়েছে বিএনপি, বিভিন্ন ট্রেড ইউনিয়ন এবং অন্যান্য গ্রুপ। ফলে বেড়ে যায় দাবির তালিকা। দাবিগুলোর মধ্যে উঠে আসে উন্নত শিক্ষার সুযোগ, অর্থনৈতিক ন্যায়বিচার ও গণতান্ত্রিক সরকার। এ সময় সরকার দাবি করে, এই আন্দোলনে মুক্তিযুদ্ধবিরোধী শক্তি এবং বেশ কিছু রাজনৈতিক দল ঢুকে পড়েছে। এদের মধ্যে বিএনপি ও জামায়াতও রয়েছে। আর এ কারণেই দেশজুড়ে ব্যাপক বিস্তৃত সহিংসতা ও সন্ত্রাসী তৎপরতা চলছে। সরকারের এই দাবি মানুষকে আরও ক্ষুব্ধ করে তোলে। বাড়তে থাকে বিক্ষোভ ও সহিংসতা।

১৮ জুলাই সরকার দেশজুড়ে ব্রডব্যান্ড ও মোবাইল ফোনে ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধ করে দেয়। তাদের লক্ষ্য ছিল ওয়েবসাইট, সামাজিক মাধ্যম ও ওয়েবভিত্তিক ফোনের যোগাযোগ বন্ধ করে দেওয়া। এই ব্যবস্থা খবর সংগ্রহ ও প্রচারে বড়ো ধরনের সংকটের জন্ম দেয়। মোবাইল ফোনের যোগাযোগও বিঘ্নিত হয়। দেশকে পুরো বিশ্ব থেকে আলাদা করে ফেলা হয়। সরকার দাবি করে, একটি ডেটা সেন্টার ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার কারণে এ সংকটের সূত্রপাত।

১৯ জুলাই একদল বিক্ষোভকারী বাংলাদেশের নরসিংদী জেলার কারাগারে ঢুকে ৮৫০ বন্দিকে মুক্ত করে। এরপর কারাগারে আগুন ধরিয়ে দেয়। ওই দিন ঢাকা মহানগর পুলিশ রাজধানীতে সবধরনের সমাবেশ ও মিছিলের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে। পরে ওই রাতে প্রধানমন্ত্রী একটি জরুরি বৈঠক ডেকে দেশে বিশেষ ক্ষমতা আইন-১৯৭৪ অনুযায়ী কারফিউ জারি করেন, যা ২০ জুলাই থেকে কার্যকর হয়। আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের জন্য এই কারফিউ জারি করা হয়। কারফিউ কিছু সময়ের জন্য শিথিল করার সুযোগও ছিল। কারফিউ জারি করার ফলে মানুষের চলাচল ও স্বাধীনতা সর্বতোভাবেই খর্ব হয়েছে।

২২ জুলাই সুপ্রিমকোর্ট মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য ৫ শতাংশ, প্রতিবন্ধী-পঙ্গু-তৃতীয় লিঙ্গের সদস্যদের জন্য ১ শতাংশ এবং উপজাতিদের জন্য ১ শতাংশ কোটা রেখে বাকি ৯৩ শতাংশ সরকারি চাকরি মেধার ভিত্তিতে নিয়োগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত জানায়। সরকার আদালতের এ অবস্থান মেনে নিয়ে প্রজ্ঞাপন জারি করে। তবে তার আগেই বিক্ষোভকারীদের দাবি আরও বিস্তৃত রূপ লাভ করে। তারা নয় দফা দাবির একটি তালিকা তৈরি করে। এর মধ্যে রয়েছে শিক্ষার্থীদের গণহত্যার জন্য প্রধানমন্ত্রীর নিঃশর্ত ক্ষমা প্রার্থনা, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান, সড়কমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের, শিক্ষামন্ত্রী মহিবুল হাসান চৌধুরী নওফেল এবং আইনমন্ত্রী আনিসুল হকের পদত্যাগ, অপ্রয়োজনীয় ও অতিরিক্ত শক্তিপ্রয়োগের তদন্ত এবং গ্রেফতারকৃত সব শিক্ষার্থীর মুক্তি। ২৪ জুলাই আংশিকভাবে ইন্টারনেট ও মোবাইল ফোনের সেবা খুলে দেওয়া হয়। তবে তাতে ক্ষোভ বা উত্তেজনা কমেনি।

গ্রেফতার ও আটক, গুম, নির্যাতন ও দুর্ব্যবহারের খবর প্রকাশিত হতে থাকে। সহিংসতা, নির্যাতন ও বিক্ষোভে অংশ নেওয়া ছাত্রীদের যৌন হয়রানির কথাও জানা যায়। এ ছাড়া বিক্ষোভ দমনে কক্সবাজারের রোহিঙ্গা শরণার্থী ক্যাম্প থেকে এক-তৃতীয়াংশ নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যদের সরিয়ে বিভিন্ন স্থানে মোতায়েন করা হয়। ফলে মিয়ানমারের সীমান্তবর্তী ওই অঞ্চলে নিরাপত্তা উদ্‌বেগ তৈরি হয়।

৩০ জুলাই প্রধানমন্ত্রী এবং আইনমন্ত্রী জানান, ১৭ জুলাই যে বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিটির ঘোষণা দেওয়া হয়েছে, তাতে আরও দুজন বিচারপতি অন্তর্ভুক্ত হবেন। যে কারণে এই কমিটির কাজের পরিধিও বাড়বে। তবে নতুন কোনো নাম ঘোষণা করা হয়নি। কাজের পরিধি বিস্তৃত হওয়া সম্পর্কে আইনমন্ত্রী বলেন—এই কমিটি ১৬ জুলাই, ২০২৪ থেকে ২১ জুলাই, ২০২৪-এর মধ্যে ঘটা সব হত্যাকাণ্ডের তদন্ত করবে।

৩১ জুলাই কর্তৃপক্ষ জামায়াতে ইসলামী নামক রাজনৈতিক দলকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ তোলা হয়, তাদের ছাত্রসংগঠন ইসলামী ছাত্রশিবির বিক্ষোভে সহিংসতা ছড়াচ্ছে। ১ ও ২ আগস্ট আবারও বিক্ষোভ হয়। এবারের দাবি, সব বন্দিকে মুক্তি এবং আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর হাতে যারা নিহত হয়েছে, তাদের জন্য ন্যায়বিচার নিশ্চিত করতে হবে। এই বিক্ষোভে একজন নিহত এবং বহু মানুষ আহত হয়।

৩ আগস্ট ছাত্ররা দেশজুড়ে বেসামরিক অসহযোগের ডাক দেয়। প্রধানমন্ত্রী পদত্যাগ না করা পর্যন্ত চলবে এই অসহযোগ। সহিংসতা আরও ছড়িয়ে পড়ে। ৪ আগস্ট শিক্ষার্থীদের সঙ্গে সরকারপন্থি ও পুলিশের সহিংসতায় ৯৮ জন নিহত হয়। এর মধ্যে পুলিশ সদস্যের সংখ্যা ১৩। সহিংসতার সময় বহু পুলিশকে দেখা যায় আওয়ামী লীগ ও তাদের সমর্থকদের সহায়তা করতে। এ সময়ও নিরপেক্ষ ছিল সেনাবাহিনী।

প্রধানমন্ত্রী তার ভাষায় 'দুষ্কৃতকারীদের' দমন করতে নাগরিকদের প্রতি আহ্বান জানান। একই সঙ্গে ৪ আগস্ট থেকে দেশজুড়ে অনির্দিষ্টকালের জন্য কারফিউ জারি করেন। উত্তেজনা কমাতে তিন দিনের সাধারণ ছুটিও ঘোষণা করেন তিনি। এর প্রতিবাদে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন 'মার্চ টু ঢাকা' কর্মসূচির ঘোষণা দেয়। দাবি তোলে প্রধানমন্ত্রীর পদত্যাগের। আবারও মোবাইল ফোনে ইন্টারনেট সেবা সীমিত করে দেয় কর্তৃপক্ষ।

লাখো মানুষ দেশজুড়ে বিক্ষোভ করতে থাকে। পুলিশ সাউন্ড গ্রেনেড ও টিয়ার গ্যাস ব্যবহার করে বিক্ষোভ ছত্রভঙ্গ করার চেষ্টা চালায়। ৫ আগস্ট ঢাকার জাতীয় স্মৃতিস্তম্ভ শহীদ মিনারে লাখো জনতা জড়ো হয়। পুলিশের সঙ্গে ব্যাপক সংঘর্ষে নিহত হয় ছয়জন। বিক্ষোভ আরও বাড়তে থাকলে প্রধানমন্ত্রী হাসিনা দেশ ছেড়ে পালিয়ে যান। সেনাপ্রধান তার পদত্যাগ এবং অন্তর্বর্তী সরকার গঠনের ঘোষণা দেন। শিক্ষার্থীরা দাবি করে, তাদের সঙ্গে আলোচনা করে একটি বেসামরিক সরকার গঠন করতে হবে।

বিক্ষোভকারীরা প্রধানমন্ত্রী ও প্রধান বিচারপতির বাসভবন, আওয়ামী লীগের দপ্তর, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্মৃতি জাদুঘর এবং দেশজুড়ে শেখ মুজিবুর রহমানের মূর্তি ভাঙচুর করে। ৫ আগস্ট রাতে দু-ধরনের দৃশ্যই দেখা গেছে—উৎসব আর প্রতিশোধ। সম্ভবত শতাধিক মানুষ ওই রাতে নিহত হয়। হামলা মূলত হয়েছে আওয়ামী লীগের নেতা ও পুলিশ সদস্যদের ওপর। আওয়ামী লীগের নেতাদের সম্পত্তি ও পুলিশ স্টেশনে সাধারণ মানুষ হামলা চালিয়েছে। ভাঙচুর করে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয় এসব স্থানে।

সরকারের পদত্যাগের পর সারা দেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি ভেঙে পড়ে। বহু জায়গা থেকেই হামলার ভয়ে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী সদস্যরা সরে যায়।

হিন্দুসহ সংখ্যালঘুদের ওপর হামলার অভিযোগও পাওয়া গেছে। সরকার পরিবর্তনের পর কয়েক দিন ধরে এমন অভিযোগ পাওয়া যায়। ৫ ও ৬ আগস্ট ২৭টি জেলার হিন্দুদের বাড়ি ও সম্পদের ওপর হামলা হয়েছে বলে দাবি করা হয়। খুলনা বিভাগের মেহেরপুর জেলায় কয়েকটি মন্দির ভাঙচুর করা হয়েছে বলেও জানা গেছে। পরে এগুলোতে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। সংখ্যালঘুদের ওপর সম্ভাব্য হামলা প্রতিরোধে শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন সংগঠন এবং সাধারণ মানুষ দল বেঁধে সংখ্যালঘুদের বাড়িঘর ও উপাসনালয় পাহারা দেওয়ার ব্যবস্থা করে। অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস দেশজুড়ে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর হামলাকে ন্যক্কারজনক বলে অভিহিত করেন। অন্তর্বর্তী সরকারের ধর্মবিষয়ক উপদেষ্টা ড. আ.ফ.ম. খালিদ হোসাইন এ ধরনের হামলার সমন্বিত একটি তালিকা প্রকাশ করেন। সংখ্যালঘুদের ওপর হামলা ঠেকানোর জন্য একটি হটলাইন নাম্বারও জানানো হয়েছে।

৫ আগস্ট পূর্ববর্তী সরকারের পতনের পর পুলিশ থানাগুলোতে কাজ করা বন্ধ করে দেয়। যাহোক, ১১ আগস্টের মধ্যে মোট ৬৩৯টি পুলিশ স্টেশনের মধ্যে ৫৯৯টি সক্রিয় হয়। মহানগর এলাকায় থানার সংখ্যা মোট ১১০টি। এর মধ্যে ৯৭টি সক্রিয় হয়। আর জেলায় ৫২৯টি থানার মধ্যে সক্রিয় হয় ৫০২টি।

মানবাধিকারবিষয়ক উদ্‌বেগ

ক. শক্তির অপ্রয়োজনীয় ও অযাচিত প্রয়োগ এবং বিচারবহির্ভূত হত্যা

নিরাপত্তা বাহিনী ছাত্রবিক্ষোভ এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট সহিংসতার বিরুদ্ধে অপ্রয়োজনীয় ও অযাচিতভাবে অতিরিক্ত শক্তিপ্রয়োগ করেছে বলে প্রমাণিত হয়েছে। পুলিশ ও আধাসামরিক বাহিনী শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভ ও সহিংস পরিস্থিতি—উভয় ক্ষেত্রেই অপ্রয়োজনীয়ভাবে অতিরিক্ত শক্তিপ্রয়োগ করেছে। এ সময় তারা রাবার বুলেট, সাউন্ড গ্রেনেড ও তাজা গুলিসহ আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করে। এর মধ্যে বার্ডশ্যুট প্যালেট ও বুলেটও রয়েছে। যদিও বিক্ষোভকারীদের প্রায় সবার হাতেই সাধারণ লাঠি, ইট বা ওই ধরনের অস্ত্রই দেখা গেছে। তবে নিরাপত্তা বাহিনী পুরো সময়টাই আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করে। এর মধ্যে রয়েছে প্যালেট শটগান, হ্যান্ডগান ও রাইফেল। তারা নিয়মিত অপ্রয়োজনীয় ও অযাচিত শক্তিপ্রয়োগ করে।

নানা প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়, নিরাপত্তা বাহিনী এ সময় হেলিকপ্টার থেকেও বিক্ষোভকারীদের ওপর গুলি চালায়, যা সহিংসতাকে আরও উসকে দেয়। কিছু কিছু ক্ষেত্রে নিরাপত্তা বাহিনী জাতিসংঘের লোগো আঁকা যানবাহনও ব্যবহার করেছে তারা। জাতিসংঘের শান্তিরক্ষী মিশনে অংশ নেওয়ায় এই বাহনগুলো বাংলাদেশে রয়েছে।

সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত প্রতিবেদন এবং আন্দোলন থেকে পাওয়া তথ্যে দেখা যায়, ১৬ জুলাই থেকে ১১ আগস্ট পর্যন্ত ছয় শতাধিক মানুষ নিহত হয়েছে। এর মধ্যে ১৬ জুলাই থেকে ৪ আগস্ট পর্যন্তই নিহত হয় অন্তত ৪০০ জন।

৫ থেকে ৬ আগস্টের মধ্যে নতুন করে বিক্ষোভে অন্তত আড়াইশ মানুষ নিহত হয়। তবে প্রতিশোধমূলক হামলায় কতজন নিহত হয়েছে, তা আজও জানা যায়নি। ৭ থেকে ১১ আগস্ট পর্যন্তও বহু মানুষ নিহত হয়। এর মধ্যে বিক্ষোভ চলাকালে সহিংসতায় আহত ব্যক্তিরাও রয়েছে। নিহতদের মধ্যে রয়েছে পথচারী, রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে বিক্ষোভ দেখতে যাওয়া মানুষ, খবর সংগ্রহ করতে যাওয়া সাংবাদিক এবং নিরাপত্তা বাহিনীর কর্মীরা। ওই সময় হাজারো বিক্ষোভকারী এবং রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে বিক্ষোভ দেখতে যাওয়া মানুষ আহত হয়। হাসপাতালগুলো ওই সময় সহিংসতায় আহত রোগীতে ভরে ওঠে। মোট নিহতের প্রকৃত সংখ্যা এখনও জানা সম্ভব হয়নি। কারফিউয়ের কারণে চলাচলে নিষেধাজ্ঞা ছিল এবং ইন্টারনেটও ছিল না। তা ছাড়া হতাহতদের তথ্য দেওয়ার ব্যাপারে রাষ্ট্রীয় বিধিনিষেধও ছিল।

হতাহতের বেশিরভাগ ঘটনাই ঘটেছে নিরাপত্তা বাহিনী এবং আওয়ামী লীগের অঙ্গসংগঠনগুলোর সদস্যদের হামলায়। আর এগুলো হয়েছে তাজা গুলি ব্যবহারের কারণেই। বিক্ষোভকারীরা সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়লেও তাদের হাতে অস্ত্র ছিল না। আর থাকলেও তা ছিল লাঠিসোঁটা ধরনের কিছু। তাদের বিরুদ্ধে নিরাপত্তা বাহিনী প্রাণঘাতী অস্ত্রের ব্যবহার করে। বিক্ষোভকারীরা কোনোভাবেই নিরাপত্তা বাহিনীর জন্য হুমকি ছিল না। তারপরও নিরস্ত্র বিক্ষোভকারী, পথচারী ও সাংবাদিকদের ওপর গুলি চালায় নিরাপত্তা বাহিনী। নিহতদের মধ্যে চার সাংবাদিক এবং অন্তত ৩২ জন শিশু রয়েছে। আহত ও আটক হয়েছে বহু মানুষ। এদের মধ্যে অনেককেই ইচ্ছাকৃতভাবে লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করা হয়েছে।

বিক্ষোভ চলাকালে বেশ কিছু ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে। যেগুলোতে স্পষ্ট দেখা যায়, নিরাপত্তা বাহিনী ইচ্ছাকৃতভাবে বিক্ষোভকারীদের ওপর তাজা গুলি ব্যবহার করছে। এ ধরনেরই একটি ভিডিওতে দেখা যায়, আবু সাঈদ নামে এক শিক্ষার্থী দু-দিকে দু-হাত প্রসারিত করে দাঁড়িয়ে আছেন। তার হাতে একটি লাঠি। দাঁড়ানোর ভঙ্গিটা অনমনীয়। এই নিরস্ত্র তরুণের ওপর গুলি চালায় পুলিশ। সরাসরি তার বুকে। গুলির আঘাতে কুঁকড়ে যায় সাঈদ। এ সময় পুলিশ কর্মকর্তা আরও দুটি গুলি চালায়।

আরেকটি ভিডিওতে দেখা যায়, ঢাকার যাত্রাবাড়িতে এক তরুণ আহত আরেক তরুণকে টেনে তোলার চেষ্টা করছে। কিছুক্ষণ পর হেলমেট পরা সাদা পোশাকে নিরাপত্তা কর্মকর্তা এসে তাদের দিকে গুলি ছুড়তে শুরু করে। আহত তরুণকে রেখে ছুটে পালায় অপর জন।

বিক্ষোভকারীদের ওপর অপ্রয়োজনীয় ও অযাচিত শক্তিপ্রয়োগের মাধ্যমে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থাগুলো আন্তর্জাতিক মানবাধিকারের মান লঙ্ঘন করেছে। মানুষের জানমালের নিরাপত্তা দেওয়ার ব্যাপারে বাংলাদেশের বাধ্যবাধকতা রয়েছে। বিশেষ করে জাতিসংঘের মৌলিক নীতির মধ্যেও আইনপ্রয়োগকারী সংস্থাগুলোর আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহারের ব্যাপারে কিছু বিধিমালা রয়েছে। এই মূলনীতিতে বলা হয়েছে, আইনপ্রয়োগকারীরা শুধু তখনই আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করতে পারবেন, যখন তার জীবন বা অন্যদের জীবন হুমকির মুখে পড়বে। অথবা অন্য কোনোভাবে পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার সুযোগ নেই। কর্তৃপক্ষেরও দায়িত্ব ছিল নিরাপত্তা বাহিনীর গুলিতে আহতদের দ্রুততম সময়ের মধ্যে চিকিৎসা নিশ্চিত করার। এ ছাড়া মানবাধিকার লঙ্ঘন, এর জন্য যারা দায়ী তাদের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে এবং ভুক্তভোগীদের যথাযথ প্রতিকারের ব্যবস্থা করতে তাৎক্ষণিকভাবে স্বতন্ত্র, পক্ষপাতহীন ও কার্যকর তদন্ত শুরুর বাধ্যবাধকতা রয়েছে কর্তৃপক্ষের।

খ. গ্রেফতার, নির্যাতন ও বাজে আচরণের অভিযোগ

শিক্ষার্থীরা ২২ জুলাই বিক্ষোভে একটি সাময়িক বিরতি দেয়। তখনই পর্যায়ক্রমে ইন্টারনেট বন্ধের কার্যক্রম তুলে নেওয়া হয়। প্রতিবেদন প্রকাশ

পেতে শুরু করে—বিএনপি ও জামায়াতের নেতা, কর্মী, ছাত্রনেতা এবং অন্য ব্যক্তিদের টার্গেট করে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। এই ব্যবস্থাগুলোর মধ্যে রয়েছে নজরদারি, হুমকি, আইনগত ব্যবস্থা। র‍্যাব, পুলিশ ও সেনাবাহিনীর যৌথ অভিযানে ঢাকাসহ দেশের অন্যান্য স্থানে হাজারো মানুষকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তল্লাশি ফাঁড়ি স্থাপন করা হয়েছে। চেক করা হচ্ছে মোবাইল ফোন, যাতে করে পুলিশের সহিংসতার ভিডিও মুছে ফেলা সম্ভব হয়।

যাদের গ্রেফতার করা হয়, তাদের বেশিরভাগকেই ২৪ ঘণ্টার মধ্যে আদালতে তোলা হয়নি। তাদের আইনি সহায়তা নেওয়ার পথ রুদ্ধ করে দেওয়া হয়। এমনকি তাদের কোথায় রাখা হয়েছে, সে তথ্যও তাদের পরিবার-পরিজনকে জানানো হয়নি। ২১ জুলাই স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় একটি সার্কুলার প্রকাশ করে। এতে বলা হয়, বন্দিদের কাছে দর্শনার্থীদের যাওয়ার অনুমতি দিতে পারবে না কারা কর্তৃপক্ষ। তাৎক্ষণিকভাবে এই নির্দেশ কার্যকর হয় সব শিক্ষার্থী ও অন্য বন্দির ওপর।

১২ জুলাই থেকে ৩ আগস্ট পর্যন্ত অন্তত সাড়ে চার লাখ অজ্ঞাতনামা এবং দুই হাজার পরিচয় শনাক্ত ব্যক্তিকে আটক বা গ্রেফতার করা হয়। এদের বিরুদ্ধে শুধু ঢাকাতে অন্তত ২৮৬টি ফৌজদারি অভিযোগ করা হয়। বিরোধী দলগুলোর দাবি, এ সময় নামে-বেনামে তাদের দলের বহু কর্মী গ্রেফতার হয়। বাংলাদেশে প্রাথমিক তদন্ত প্রতিবেদনে প্রায়শই অজ্ঞাতনামা বলে কয়েকশ ব্যক্তিকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ফলে অকারণ গ্রেফতার ও আটকের ঝুঁকি বরাবরই ব্যাপক বিস্তৃত ছিল।

ওএইচসিএইচআর-এর হাতে আসা প্রতিবেদন অনুসারে, ঢাকাসহ আশপাশের বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজগুলোতে ব্লকরেইড চালানো হয়। নিশ্চিত এই তথ্যে বলা হয়, এ সময় বিপুলসংখ্যক আইনপ্রয়োগকারী সংস্থার সদস্য সুনির্দিষ্ট এলাকা ঘেরাও করে সেখানে ঢুকতে বা বের হতে চাওয়া প্রত্যেক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসাবাদ করে। গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে বাড়ি বাড়ি গিয়ে রেইড দেওয়া হয়। কিছু ক্ষেত্রে কোনো ওয়ারেন্টও দেখানো হয়নি। আইনপ্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যদের দাবি, তারা সহিংসতা ও সম্পদ বিনষ্টকারীদের গ্রেফতার করেছে। আর এ ক্ষেত্রে তারা তথ্য নিয়েছে সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া ভিডিওগুলো বিশ্লেষণ করে।

প্রতিবেদনে দাবি করা হয়, এভাবে যাদের গ্রেফতার করা হয়েছে তারা চরম দুর্ব্যবহারের শিকার হন। পুলিশের হেফাজতে তাদের কারও কারও ওপর নির্যাতনও করা হয়। বাংলাদেশ কনভেনশন এগেইনস্ট টর্চার অ্যান্ড আদার ক্রুয়েল, ইনহিউম্যান অর ডিগ্রেডিং ট্রিটমেন্ট অব পানিশমেন্ট-এ (সিএটি) স্বাক্ষরকারী রাষ্ট্র। *সিএটি*-এর শর্তানুসারে, যেকোনো পরিস্থিতিতে নির্যাতন ও নিষ্ঠুরতা, অমানবিক ও অবমাননাকর আচরণ ও শাস্তি নিষিদ্ধ।

গণ অধিকার পরিষদ নামক পার্টির প্রধান নুরুল হককে গ্রেফতার করে পাঁচ দিন রিমান্ডের পর আদালতে তোলা হয়। তার বিরুদ্ধে সেতুভবনে ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগের অভিযোগ তোলা হয়। নুরুলের স্ত্রী জানান, রিমান্ডের সময় তার স্বামীর ওপর অকথ্য নির্যাতন চালানো হয়। ফুটেজে দেখা গেছে, তাকে খালি পায়ে আদালতে আনা হয়েছে। তীব্র ব্যথার কারণে তিনি দাঁড়াতেও পারছিলেন না। ৬ আগস্ট তার জামিন মঞ্জুর হয় এবং তিনি মুক্তি পান।

কোটা সংস্কার আন্দোলনের অন্যতম সমন্বয়ক নাহিদ ইসলাম নিখোঁজ হন ১৯ জুলাই। তার বাবা জানান, এক বন্ধুর বাসা থেকে মধ্যরাতে নাহিদকে উঠিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। ২৪ ঘন্টার পর তার খোঁজ পাওয়া যায়। সিসিটিভির ফুটেজ থেকে জানা যায়, র‍্যাবের সদস্যরা তাকে নিয়ে যায়।

নাহিদ জানান, তাকে গোয়েন্দারা জিজ্ঞাসাবাদ ও নির্যাতন করেছেন। দুই কাঁধে এবং বাম পায়ে রক্ত জমে যাওয়ার জন্য তিনি চিকিৎসা নেন। ২৬ জুলাই নাহিদসহ আরও দুই সমন্বয়ক আসিফ মাহমুদ ও আবু বাকের মজুমদারকে অজ্ঞাত পরিচয় সাদা পোশাকপরা ব্যক্তিরা জোর করে তুলে নিয়ে যায়। নাহিদ এ সময় ঢাকার গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র হাসপাতালে চিকিৎসা নিচ্ছিলেন। এর পরের দিন আরও তিন সমন্বয়ককে তুলে নিয়ে যাওয়া হয়।

গোয়েন্দা বিভাগ জানায়, নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য এদের নিয়ে যাওয়া হয়েছে। গোয়েন্দা বিভাগের এ দাবি ভিকটিমদের পরিবার প্রত্যাখ্যান করে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান জানান—'সমন্বয়কদের গ্রেফতার করা হয়নি। পুলিশ যদি মনে করে, তারা নিরাপদ; তাহলে তাদের ছেড়ে দেওয়া হবে।' এই ছয় সমন্বয়ককে দিয়ে জোর করে একটি ভিডিও বিবৃতি পড়ানো হয়। এতে তারা ঘোষণা করেন যে, তারা বিক্ষোভের সমাপ্তি টানছেন। তাদের ১ আগস্ট মুক্তি দেওয়া হয়।

সরকার পতনের পর আটকদের মধ্যে দুই হাজার চারশ জনকে জামিনে মুক্তি দেওয়া হয়। তবে আরও কতজন আটক বা অজ্ঞাত স্থানে আছেন, তা এখনও পরিষ্কার নয়। ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন অন সিভিল অ্যান্ড পলিটিক্যাল রাইটসের (ইসিসিপিআর) নয় নম্বর অনুচ্ছেদ অনুসারে, যথাযথ আইনগত প্রক্রিয়া অনুসরণ না করে এভাবে গণগ্রেফতার নিষিদ্ধ। নয় নম্বর অনুচ্ছেদে ব্যক্তির স্বাধীনতা ও নিরাপত্তার অধিকারের নিশ্চয়তা দেওয়া হয়। বাংলাদেশের যেসব অ্যাক্টিভিস্ট দেশের বাইরে থাকেন, তাদেরকেও টার্গেট করে হুমকি দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ রয়েছে।

গ. বাক্স্বাধীনতা বিধিনিষেধ—ইন্টারনেট বন্ধ

যোগাযোগে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করার মাধ্যমে বাক্স্বাধীনতা এবং শান্তিপূর্ণভাবে সমাবেশের অধিকারে ভয়াবহভাবে হস্তক্ষেপ করা হয়। বিশেষ করে ১৮ থেকে ২৩ জুলাই এবং ৪ ও ৫ আগস্ট সরকার ইন্টারনেটের লাইন বিচ্ছিন্ন করার মাধ্যমে এই অধিকারকে খর্ব করা হয়। এ ছাড়াও অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিকসহ অন্যান্য মৌলিক অধিকার হরণ করা হয়েছে। সরকার অবশ্য দাবি করে, একটি প্রধান অবকাঠামো বিক্ষোভকারীরা ধ্বংস করে দেওয়ায় ইন্টারনেট সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। তবে *ওএইচসিএইচআর*-এর তদন্তে দেখা গেছে, সরকার ইচ্ছাকৃতভাবে ইন্টারনেট সংযোগ বন্ধ করে দিয়েছে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে তথ্যের প্রবাহ বন্ধ করার জন্যই এ ব্যবস্থা নেওয়া হয়, যাতে করে বিক্ষোভকারীরা তাদের কার্যক্রম চালিয়ে নিতে না পারে। আইনপ্রয়োগকারী সংস্থাগুলো বিক্ষোভ দমন করতে যে ব্যবস্থা নিচ্ছিল, তা লোকচক্ষুর আড়ালে রাখাও এর অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। যেন পরবর্তীকালে তাদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেওয়া না হয়।

ইন্টারনেট প্রায় বিচ্ছিন্ন করে দেওয়ার পাশাপাশি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম পুরোপুরি বন্ধ করে দেওয়া হয়। যেন বিক্ষোভের তথ্য প্রবাহ বন্ধ থাকে। ফেসবুক, এক্স (সাবেক টুইটার) ও ইন্সটাগ্রাম এই বিক্ষোভ আয়োজনে বড়ো ভূমিকা রাখে। এগুলোতে তাৎক্ষণিক হালনাগাদ তথ্য শেয়ার করা সম্ভব। ফলে অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক সমর্থন পাওয়া সহজ হয়। যাহোক, সরকারের ইন্টারনেট বন্ধ করা এই প্রচেষ্টাগুলোকে উল্লেখযোগ্যভাবে ব্যাহত করে। তবে

সরকার-পরিচালিত বেশ কিছু সংবাদমাধ্যম তাদের প্রচার অব্যাহত রাখে। তবে অনলাইন সংস্করণগুলো বন্ধ ছিল। দেশজুড়ে কারফিউ ও ইন্টারনেট শাটডাউন সংকটকে আরও বাড়িয়ে তোলে। এর ফলে চলাচল ও বাক্‌স্বাধীনতা, তথ্য জানার অধিকার খর্ব হয়। বেশ কয়েকজন সাংবাদিককে সংবাদ প্রচারের জন্য সরকারের হুমকির মুখে পড়তে হয়।

আইসিসিপিআর-এর ১৯ নম্বর অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, সবার বাক্‌স্বাধীনতা এবং তথ্য জানার, চাওয়ার ও প্রচার করার অধিকার রয়েছে। এতে বিধিনিষেধ দিতে চাইলে তা অবশ্যই আইনের আওতায় হতে হবে। এ ক্ষেত্রে শর্ত প্রযোজ্য। বলা হয়েছে, জননিরাপত্তা, রাষ্ট্রের নিরাপত্তা, জনশৃঙ্খলা, গণস্বাস্থ্য বা নৈতিকতা হুমকির মুখে পড়লে এ অধিকার খর্ব করা যেতে পারে। যেমন ইচ্ছাকৃত ইন্টারনেট দীর্ঘ সময়ের জন্য বন্ধ করে দেওয়া এই ধরনের শর্ত পূরণ করে না। এটি আন্তর্জাতিক মানদণ্ডের লঙ্ঘন।

ঘ. চলাফেরার স্বাধীনতার ওপর বিধিনিষেধ এবং এর ফলে বৃহত্তর প্রভাব

দ্য ইউনিভার্সাল ডিক্লারেশন অব হিউম্যান রাইটস (ইউডিএইচআর, অনুচ্ছেদ ১৩) এবং আইসিসিপিআর (অনুচ্ছেদ ১২) চলাফেরার স্বাধীনতার গ্যারান্টি দেয়। এটা বেসামরিক ও রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অধিকারেরও নিশ্চয়তা দেয়।

দীর্ঘ কারফিউ চলাফেরার ওপর যে বিধিনিষেধ দেয় বা যেসব প্রতিবন্ধকতার কারণে যোগাযোগে বাধা সৃষ্টি হয় এবং কারফিউ প্রয়োগে যেসব ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়, তা থেকে দ্রুত স্বাভাবিকতায় ফেরার জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ অপরিহার্য। একই সঙ্গে মানবাধিকারের প্রতিও সম্মান নিশ্চিত করতে হবে। চলাচলের স্বাধীনতার ওপর বিধিনিষেধগুলো দৈনন্দিন জীবন, বাণিজ্য ও প্রয়োজনীয় পরিষেবাগুলো প্রাপ্তিতে উল্লেখযোগ্যভাবে বাধা সৃষ্টি করে।

হাসপাতালে ছিল সাধারণ রোগী ও আহতদের উপচে পড়া ভিড়। কিন্তু অনেক আহত বিক্ষোভকারী সময়মতো চিকিৎসা পায়নি। ব্যবসা ও পরিবহন অর্থনীতির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। সহিংসতার কারণে ওগুলোও ক্ষতিগ্রস্ত

হয়েছে। কারফিউ এবং ইন্টারনেট বন্ধের কারণে শুধু যে জরুরি পরিষেবা ব্যাহত হয়েছে তা-ই নয়, নিত্যপণ্য ও সেবার চেইনও চাপে পড়েছে। আগে থেকেই সংকটে থাকা অর্থনীতিকে আরও সংকটে ফেলেছে এই পরিস্থিতি। স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করে দেওয়ায় শিক্ষার অধিকারও গুরুতরভাবে লঙ্ঘিত হয়েছে। শিশুদের স্বাভাবিক বিকাশ এতে ব্যাহত হয়। এই অসন্তোষের সামগ্রিক ফলাফল ব্যাপক বিস্তৃত। স্থানীয় বেসরকারি সংস্থাগুলোর দেওয়া তথ্যানুসারে, সহিংসতার কারণে বহু পরিবার তাদের বাড়িঘর ছেড়ে নিরাপদ স্থানে আশ্রয় নেয়। বহু বাড়িতে তল্লাশি চালানো হয়েছে। মানুষ পালাতে বাধ্য হয়েছে। বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি চিকিৎসা ও ত্রাণসহায়তা দিয়েছে বহু মানুষকে।

পরামর্শ

বিক্ষোভ এবং এ প্রতিবেদনে যে অবস্থার কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তার কারণে সৃষ্ট দেশের বর্তমান পরিস্থিতি সামাল দিতে নিম্নলিখিত অন্তর্বর্তী পরামর্শগুলো দেওয়া হচ্ছে। তবে দীর্ঘমেয়াদে সমন্বিত আইনগত ও প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারেরও প্রয়োজন হবে।

সকল রাজনীতিসংশ্লিষ্ট ব্যক্তির প্রতি পরামর্শ :

- পরিস্থিতি শান্ত করাকে অগ্রাধিকার দিন। জীবনের ওপর আঘাত করা থেকে বিরত থাকুন এবং এরূপ আঘাতকে প্রতিরোধ করুন।
- ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেওয়া থেকে বিরত থাকুন।
- মতপ্রকাশের স্বাধীনতা ও শান্তিপূর্ণ সমাবেশের অধিকার সমুন্নত রাখুন।
- সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সুরক্ষা নিশ্চিত করুন। ঘৃণা, বৈষম্য বা সহিংসতা তৈরি করে এমন উসকানিমূলক কাজ থেকে বিরত থাকুন।
- মানবাধিকার লঙ্ঘন বা নির্যাতনের যেকোনো ঘটনায় কার্যকরভাবে নিন্দা করুন। বিশেষ করে, আপনাদের নিজেদের দলের সদস্য বা সমর্থকদের যেকোনো কর্মকাণ্ডের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করুন। তাদের দ্বারা কারও

অধিকার লঙ্ঘন কিংবা ক্ষমতার অপব্যবহার যাতে না হয় সেদিকে খেয়াল রাখুন। মানবাধিকার লঙ্ঘনের যেকোনো চেষ্টাকে প্রতিরোধ করার জন্য আইনের পক্ষে থাকুন।

- সংস্কার প্রক্রিয়াটি যেন একটি স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক পদ্ধতিতে পরিচালিত হয়, তা নিশ্চিত করুন। সংস্কার হতে হবে অন্তর্ভুক্তিমূলক। আর তা উন্মুক্ত থাকবে সমস্ত বাংলাদেশির অর্থপূর্ণ অংশগ্রহণের জন্য।

অন্তর্বর্তী সরকারের প্রতি :

- মানবাধিকারের নীতিমালা মেনে একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক ও অংশগ্রহণমূলক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে গণতান্ত্রিক শৃঙ্খলা এবং আইনের শাসন পুনরুদ্ধারের জন্য পদক্ষেপ নিন।
- বিচার বিভাগ, নিরাপত্তা বিভাগ ও অন্য প্রতিষ্ঠানসমূহে যেকোনো নিয়োগ ও বরখাস্ত যাচাই করার জন্য একটি পদ্ধতিগত বিকাশের ব্যবস্থা করুন।
- আইনপ্রয়োগকারী সংস্থাগুলোকে বলপ্রয়োগ সীমিত করার সুস্পষ্ট নির্দেশনা প্রদান করুন। বিশেষ করে, আন্তর্জাতিক মানবাধিকার মানদণ্ডের সাথে সংগতিপূর্ণভাবে আগ্নেয়াস্ত্রের ব্যবহার এবং প্যালেট বন্দুকের ব্যবহার বন্ধ করতে হবে।
- যখন শক্তির ব্যবহার অতিপ্রয়োজনীয় হয়ে দেখা দেবে, তখন তুলনামূলকভাবে কম প্রাণঘাতী অস্ত্রের সংযত ব্যবহারকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। সব পাবলিক অর্ডার ম্যানেজমেন্টে একটি ডি-এস্কেলেশন পদ্ধতির ওপর জোর দিন।
- কোনো প্রতিবাদ সমাবেশে বা অন্য কোনো স্থানে বর্ডার গার্ড এবং র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন মোতায়েন করা থেকে বিরত থাকুন।
- পাবলিক অর্ডার ম্যানেজমেন্টের কাজ এবং এই বাহিনীর একটি ব্যাপক পর্যালোচনা শুরু করুন। তাদের কার্যক্রম, কমান্ড, নিয়ন্ত্রণ এবং জবাবদিহিতা প্রক্রিয়া ও অপারেশনাল মতবাদ পর্যালোচনা করুন।
- নিশ্চিত করুন যে, আহত বিক্ষোভকারী, নিরাপত্তা বাহিনী ও পথচারীরা অবিলম্বে প্রয়োজনীয় চিকিৎসাসেবা পাচ্ছে। সব ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির জন্য চিকিৎসা ও সহায়তার জন্য বাধাহীন অ্যাক্সেসের সুবিধা নিশ্চিত করুন।

- বেআইনি সহিংসতা থেকে সরকারি ও ব্যক্তিগত সম্পত্তি রক্ষা করার পাশাপাশি বৈষম্য ছাড়াই শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদের সুবিধা নিশ্চিত করুন।

- আইনপ্রয়োগকারী সংস্থা এবং অন্যান্য সরকারি বাহিনীকে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়সহ যেকোনো প্রতিশোধমূলক সহিংসতার বিরুদ্ধে ঝুঁকিতে থাকা জনসংখ্যাকে রক্ষা করার নির্দেশ দিন। যেকোনো মামলা নিষ্ঠার সাথে তদন্ত করুন এবং চিহ্নিত অপরাধীদের বিচার করুন। বিক্ষোভ বা প্রতিশোধমূলক সহিংসতার সাথে জড়িতদের গ্রেফতারের সংখ্যা এবং সংশ্লিষ্ট অভিযোগ প্রকাশ করুন। অবিলম্বে জনগণকে তা অবহিত করুন এবং আটক ব্যক্তিদের পরিবার ও আইনজীবীদের সাথে পরামর্শ গ্রহণের সুযোগ দিন। নির্বিচারে আটককৃতদের অবিলম্বে মুক্তি দিন। নিশ্চিত করুন যে, অন্য সবাইকে অবিলম্বে আদালতে হাজির করা হচ্ছে এবং যেখানে সম্ভব জামিন দেওয়া হচ্ছে। সব বন্দির জন্য যথাযথ প্রক্রিয়া এবং আইনি প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করুন।

- নিরাপত্তা বাহিনী বা সহিংসতার সঙ্গে জড়িতদের গুরুতর আঘাত, মৃত্যু বা আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহারে জড়িত এমন সব ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার মানগুলোর সাথে সামঞ্জস্য রেখে একটি বিস্তৃত স্বাধীন, নিরপেক্ষ ও স্বচ্ছ তদন্ত করুন। যা দায়ী ব্যক্তিদের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে পারে। যারা অপ্রয়োজনীয় ও অযাচিত শক্তিপ্রয়োগ করেছে বা আদেশ দিয়েছে, তাদের জন্য জবাবদিহিতা নিশ্চিত করুন। ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণ এবং কার্যকর প্রতিকার প্রদান করার ব্যবস্থা করুন।

- সিসিটিভি ফুটেজ ও অন্যান্য রেকর্ডিংসহ সংশ্লিষ্ট সব প্রমাণ রক্ষা করুন। টেম্পারিং, ক্ষয়ক্ষতি বা ক্ষতিরোধ করার জন্য প্রমাণ সুরক্ষিত করুন। এই ধরনের ক্ষতিকর কাজের সাথে জড়িতদের বিরুদ্ধে উপযুক্ত শাস্তিমূলক ও ফৌজদারি ব্যবস্থা নিন।

- আন্তর্জাতিক মানবাধিকার ব্যবস্থার সহায়তায় সাম্প্রতিক ঘটনাগুলোর তদন্ত নিশ্চিত করুন, যেন বৃহত্তর সত্য ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠিত হয়।

- সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অভিযোগের সমাধানের জন্য উন্মুক্ত সংলাপের সুযোগ সৃষ্টি করুন, যার লক্ষ্য হবে দীর্ঘস্থায়ী সমাধান; যা বাংলাদেশের সব মানুষের স্বার্থের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ হবে। সিদ্ধান্ত গ্রহণে অংশগ্রহণমূলক দৃষ্টিভঙ্গি ও সংলাপের সংস্কৃতিকে বিকশিত করুন।

- ভয়ভীতি বা প্রতিশোধ ছাড়াই মিডিয়াকে স্বাধীনভাবে এবং নিরাপদে কাজ করার সুযোগ দিন। তথ্যের প্রবেশাধিকার এবং সংবাদপত্রের স্বাধীনতা নিশ্চিত করুন।
- অতিরিক্ত শক্তিপ্রয়োগের অপ্রয়োজনীয় ও অযাচিত ব্যবহার, নির্বিচারে গ্রেফতার, গুম প্রতিরোধ করুন এবং পুনরাবৃত্তি না হওয়ার গ্যারান্টি দিন। সম্পূর্ণ স্বাধীন ও নিরপেক্ষ তদন্তের অপেক্ষায় থাকা কমান্ড স্তরসহ জড়িত নিরাপত্তা কর্মকর্তাদের বরখাস্ত করুন।

আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের প্রতি :

- নাগরিকদের মানবাধিকার নিশ্চিত করতে বাংলাদেশকে সমর্থন করুন।
- ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য প্রতিকার নিশ্চিত করতে এবং বৃহত্তরভাবে তথ্য অনুসন্ধান ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার প্রচেষ্টাকে সমর্থন করুন।
- প্রাতিষ্ঠানিক ও নিরাপত্তা খাতের সংস্কার করুন।
- অন্তর্বর্তী সময়ে মানবাধিকার সুরক্ষার জন্য অন্তর্বর্তী সরকারকে সহায়তা প্রদানে ওএইচসিএইচআর-কে সহায়তা করুন।

الله أكبر
الحرية الثانية

রিয়া
মুহিব

ভারতের বিনিয়োগ ছিল হাসিনায়; বাংলাদেশে নয়

(নিবন্ধটি ফ্রান্স ২৪-এ *ইন্ডিয়া ওভার-ইনভেস্টেড ইন হাসিনা অ্যান্ড আন্ডার-ইনভেস্টেড ইন বাংলাদেশে—অ্যান্ড ইস নাও প্যানিকিং* শিরোনামে প্রকাশিত হয়। ১৫ আগস্ট প্রকাশ করা এ নিবন্ধটি লেখেন লীলা জাসিন্টো)

---

২১ বছর বয়সি তরুণটি ঢাকার স্থাপত্যবিদ্যার ছাত্র। সামাজিক মাধ্যমে তিনি যখন বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের নির্যাতিত হওয়ার খবর পান, তখন প্রথমেই খোঁজ নিয়ে দেখেন তার হিন্দু প্রতিবেশীরা কেমন আছেন।

ছাত্র আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন তিনি। এই আন্দোলনের কারণেই বাংলাদেশের সবচেয়ে দীর্ঘ সময়ের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পদত্যাগ করতে বাধ্য হন। ওই আন্দোলনে সরকারের শক্তিপ্রয়োগের কারণে তিন শতাধিক মানুষ নিহত হয়। রাজপথের আন্দোলনে যোগ না নিয়ে তরুণটি তার প্রযুক্তিগত দক্ষতার মাধ্যমে অনলাইন নজরদারি ও সরকার আরোপিত ইন্টারনেট ব্লকেডের মধ্যে কী করে কাজ করা যায় এবং আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যায়, সেটা নিয়ে কাজ করার জন্য গঠিত একটি টিমে ছিলেন।

আগন্তুক বলেন, হিন্দুদের ওপর হামলা কখনোই ছাত্র আন্দোলনের লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য ছিল না।

বাংলাদেশের রাজধানী থেকে ফোনে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তরুণ বলেন—'আমি কিছুটা অবাক হয়েছি। কারণ, আমাদের দেশের মানুষ শান্তিপূর্ণভাবে একসঙ্গে থাকেন। আমরা নিজেদের মধ্যে কোনো নৈরাজ্য বা অশান্তি চাই না। আমরা খবরগুলো পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই খোঁজ নেওয়ার চেষ্টা করেছি, এগুলো সত্য কি না।'

শেখ হাসিনার পদত্যাগের কয়েক ঘণ্টা পর সে তরুণ ঢাকার নবীনবাগ এলাকায় বসবাসকারী হিন্দুদের খোঁজ নিতে যান। সেখানে সব কিছুই শান্ত ছিল। তিনি বলেন—'ওই এলাকায় একটি হামলার ঘটনাও ঘটেনি। গত কয়েক দিন ধরে আমি ওই এলাকার ওপর নজর রাখছি। আমি ওই এলাকায় বসবাসকারী ও দোকানদারদের সঙ্গেও কথা বলেছি। সবকিছু ঠিকঠাক আছে।'

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ও ভারতীয় মূলধারার টিভি চ্যানেলগুলোতে ওই দিন থেকেই হিন্দুদের বাড়ি, মন্দির ও ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানে হামলার খবর প্রচার হতে থাকে। তরুণটি তার বিষয়টির ওপর নজর রাখতে সারা দেশে ছড়িয়ে থাকা তার বন্ধুদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছিলেন। তিনি বলেন—'আমি তাদের সঙ্গে রোজ যোগাযোগ করতাম। তারা আমাকে জানায়, তারা মন্দিরগুলো পাহারা দেওয়ার চেষ্টা করছে। তারা আমাকে জানিয়েছে, তেমন কোনো সহিংসতার ঘটনা ঘটেনি।'

হাসিনা ভারতে পালিয়ে যাওয়ার অল্প সময় পরই উদ্‌যাপনকারীদের একটি অংশ মবে পরিণত হয়। এই মবের দাঙ্গাকারীরা আওয়ামী লীগের দলীয় অফিস ও হাসিনার পরিবারের রাজনৈতিক উত্তরাধিকারের সব প্রতীকে হামলা চালায়। এর মধ্যে হাসিনার বাবা শেখ মুজিবুর রহমানের ভাস্কর্য এবং তার স্মৃতি জাদুঘরও রয়েছে।

মুসলিম সংখ্যাগুরু বাংলাদেশে হিন্দুরা সবচেয়ে বড়ো সংখ্যালঘু গোষ্ঠী। দেশের ১৮ কোটি মানুষের মধ্যে তাদের সংখ্যা ৮ শতাংশ। তারা ঐতিহ্যগতভাবেই আওয়ামী লীগের সমর্থক। ফলে তাদের ওপর দাঙ্গাকারীদের ক্ষোভ ছিল।

হাসিনা ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার এক সপ্তাহ পর হিন্দু এবং অন্য সংখ্যালঘু গোষ্ঠীর ওপর দুই শতাধিক হামলা হয়েছে বলে দাবি করে সংখ্যালঘুদের অধিকার সংগঠন বাংলাদেশ হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ। তবে হামলার সঠিক সংখ্যা ও উদ্দেশ্য জানা বেশ কঠিন। ছাত্র আন্দোলনকে কঠোরভাবে দমনে শক্তিপ্রয়োগের জন্য হামলার শিকার হয় পুলিশ। ফলে হাসিনার পতনের পর থেকে এক সপ্তাহ পর্যন্ত তারা কর্মবিরতি পালন করে।

হাসিনার পতনের পরের কয়েকদিন দেশজুড়ে চরম নৈরাজ্য বিরাজ করছিল। গুজব এবং অনলাইনে বিভ্রান্তিকর তথ্যের জন্য সংখ্যালঘুদের মধ্যে আতঙ্ক

ছড়িয়ে পড়ে। পরে এই আতঙ্ক সন্দেহে পরিণত হয়। বিশেষ করে ফ্যাক্টচেকাররা যখন দেখান, যেসব হামলার ছবি ও ভিডিও ব্যবহার করা হচ্ছে তার বেশিরভাগই পুরোনো, নয়তো বট ব্যবহার করা হয়েছে। এমনকি ভারতে ঘটে যাওয়া ঘটনাকেও বাংলাদেশের বলে প্রচার করা হয়েছে।

ভারতীয় উপমহাদেশে ধর্মকে একটি পুরোনো ও ভয়াবহ ফাটলরেখা হিসেবে বিবেচনা করা হয়। ব্রিটিশ উপনিবেশের সময় ধর্মীয় পরিচয়কে কেন্দ্র করে বহু রক্তাক্ত ঘটনা এখানে ঘটেছে। আধুনিক দক্ষিণ এশিয়ার মানচিত্র তৈরির পেছনেও ধর্মের ভূমিকা রয়েছে। ধর্মীয় কারণে বিভাজনের চেহারাই আবার মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে।

বাংলাদেশি হিন্দুদের আতঙ্ক এবং বিভ্রান্তিকর তথ্যের বন্যার মধ্যে হিন্দু সংখ্যাগুরু ভারতের সঙ্গে নানা মাত্রার কূটনৈতিক সংকট তৈরি হয়। ক্ষমতা, প্রভাব, সম্পদ ও প্রাপ্যতা নিয়ে দ্বন্দ্ব চলতে থাকে।

শেখ হাসিনার পতন দক্ষিণ এশিয়ার ভূরাজনৈতিক রাজনীতির একটি নতুন অংশের ওপর আলো ফেলেছে, যা আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় এড়িয়ে গেছে। তবে এখন বিষয়টিকে পুরোপুরি অগ্রাহ্য করার সুযোগ নেই। কারণ, বাংলাদেশে 'জেন-জি বিপ্লব' নামে পরিচিত এই আন্দোলন কূটনৈতিক সম্পর্কের খোলনলচে পালটে দিয়েছে।

সবার জন্য 'বর্ষার বিপ্লব'

গণ-অভ্যুত্থানে ব্যাপক মাত্রার সহিংসতা হাসিনার পতনের পরপরই ড. মুহাম্মদ ইউনূসকে ক্ষমতায় নিয়ে আসে। নোবেলবিজয়ী এই অর্থনীতিবিদ অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। পরবর্তী নির্বাচন পর্যন্ত তিনি এই পদে থাকবেন।

অলিম্পিক গেমসে যোগ দেওয়ার জন্য ড. ইউনূস প্যারিসে অবস্থান করছিলেন। হাসিনার পতনের পরপরই তিনি ঢাকায় ফেরেন। এরপর সাংবাদিকদের তিনি বলেন, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতিকেই তিনি সবচেয়ে বেশি প্রাধান্য দিচ্ছেন।

সোমবার ড. ইউনূস ঢাকেশ্বরীর জাতীয় মন্দিরে হিন্দু সম্প্রদায়ের সদস্যদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। দেশের এই সর্ববৃহৎ হিন্দু মন্দিরে গিয়ে তিনি সংযমের আহ্বান জানান। বাংলাদেশের সব নাগরিকের জন্য সম-অধিকার ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে তিনি সব ধরনের সহযোগিতার আশ্বাস দেন।

বহু বাংলাদেশি শিক্ষার্থী ও সুশীল সমাজের সদস্য সংখ্যালঘুদের অধিকার রক্ষায় যার যার অবস্থানে থেকে কাজ করেছেন। ইন্সটাগ্রামের মতো সামাজিক মাধ্যম ভরে ওঠে মন্দির পাহারা দেওয়া ছাত্রদের ছবিতে।

ঢাকাভিত্তিক বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব পিস অ্যান্ড সিকিউরিটি স্টাডিজের সিনিয়র ফেলো শাফকাত মুনির মনে করেন, হাসিনার পতনপরবর্তী সময়ে অন্তর্ভুক্তিমূলক ও বহুত্ববাদ গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি হওয়া উচিত। তিনি বলেন—'প্রথমত, আমরা সংখ্যালঘুদের ওপর কিছু দুর্ভাগ্যজনক হামলা প্রত্যক্ষ করেছি। তবে আমি এও বলব, প্রচুর মিথ্যা তথ্যও এ সময় ছড়িয়েছে। আমি বলতে চাই, বাংলাদেশের জন্য, বাংলাদেশের মানুষের জন্য একটি ঘটনাও অনেক বড়ো কিছু। এই আন্দোলনকে আমি বলি বর্ষার বিপ্লব। (বর্ষা যেমন নির্বিশেষে সকলের প্রতি বর্ষিত হয়, তেমন) এটা সব বাংলাদেশির বিপ্লব, তারা যে বিশ্বাসেরই হোন না কেন। কাজেই আমাদের জন্য বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যে, কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠী যেন তার বা তাদের বিশ্বাসের জন্য আক্রান্ত না হয়।'

হাসিনা বনাম একটি ইসলামপন্থি বাংলাদেশ

বাংলাদেশের চার হাজার কিলোমিটার সীমান্তজুড়ে থাকা ভারতের বহু সংবাদ উপস্থাপক, সম্পাদক ও বিশ্লেষক বাংলাদেশ সরকারের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির আশ্বাসের সঙ্গে একমত নন। ভারতের মূলধারার সংবাদমাধ্যম এখন বাংলাদেশের ইসলামপন্থি দলগুলোর ওপরই বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে। অবশ্য এই সংবাদমাধ্যমগুলোর বেশিরভাগই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ভারতীয় জনতা পার্টির সরকারের মুখপাত্র। এই সংবাদমাধ্যমের একটির শিরোনাম ছিল—'জামায়াতে ইসলামীই কি? পাকিস্তান সমর্থিত এ দলই শেখ হাসিনার সরকারকে টেনে নামিয়েছে'। আরেক সংবাদমাধ্যমে এক জ্যেষ্ঠ বিজেপি নেতার বরাত দিয়ে জানানো হয়—'জামায়াত হয়তো বাংলাদেশের নিয়ন্ত্রণ নিতে যাচ্ছে'।

বাংলাদেশের ৫৩ বছরের ইতিহাসে কখনোই জামায়াতে ইসলামী সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায়নি। তবে বিরোধী দল বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপির সঙ্গে মাঝেমধ্যে রাজনৈতিক জোট করেছে তারা। জামায়াত নামে অধিক পরিচিত এ দলকে গত ১ আগস্ট নিষিদ্ধ করা হয়। কোটাবিরোধী আন্দোলনে হতাহতের জন্য বিরোধী দল বিএনপি ও জামায়াতকে দায়ী করে এ পদক্ষেপ নেন শেখ হাসিনা। তবে হতাহতের ঘটনার সঙ্গে যুক্ত থাকার অভিযোগ অস্বীকার করে বিএনপি-জামায়াত। এই আন্দোলনেই শেষ পর্যন্ত শেখ হাসিনার পতন হয়। মঙ্গলবার বাংলাদেশের একটি আদালত হাসিনার বিরুদ্ধে হত্যামামলার কার্যক্রম শুরু করে। গণ-অসন্তোষের সময় নিহত এক ব্যক্তির স্বজনদের করা এ মামলায় হাসিনা প্রশাসনের আরও ছয় সদস্যেরও নাম রয়েছে।

বাংলাদেশের ছাত্রনেতারা বারবারই সাংবাদিকদের বলছেন, তারা মৌলিক পরিবর্তন চান। এদের বেশিরভাগেরই দেশের মূলধারার দুটি রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগ ও বিএনপির ওপর আস্থা নেই।

ড. ইউনূসকে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান হিসেবে আমন্ত্রণ জানানোর মধ্য দিয়ে তারা আওয়ামী লীগ ও বিএনপির নেতৃত্বে বিগত দিনে চলে আসা রাজনৈতিক ধারার প্রতি তাদের অনাস্থা প্রকাশ করেছেন। তবে তাদের বার্তা ভারতীয় বিশ্লেষকদের আশ্বস্ত করতে পারেনি। ওয়াশিংটন ডিসি-ভিত্তিক উইলসন সেন্টারের দক্ষিণ এশিয়া-বিষয়ক ইনস্টিটিউশনের পরিচালক মাইকেল কুগেলম্যান বিষয়টিকে ব্যাখ্যা করেন এভাবে—'আমি মনে করি, বহু ভারতীয়র ধারণা, ধর্মনিরপেক্ষ ও উদার বাংলাদেশ এবং ইসলামি শক্তির নিয়ন্ত্রণাধীন অস্থিতিশীল বাংলাদেশের মধ্যে বিভাজক রেখাটি হচ্ছেন শেখ হাসিনা।'

সব ডিম শেখ হাসিনার ঝুড়িতে

হাসিনার পতনের পরিস্থিতি তৈরি করতে বহু বছর লেগে গেছে। সরকারি চাকরিতে বিতর্কিত কোটাব্যবস্থা নিয়ে যে বিক্ষোভ, তা তার পতনকে ত্বরান্বিত করেছে। গত ৭ জানুয়ারির নির্বাচনে চতুর্থবারের মতো জয়ী হয়ে ক্ষমতায় এলে বাংলাদেশের এই লৌহমানবীর ব্যাপারে গণ-অসন্তোষ আরও বাড়ে।

যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তর এই সংসদ নির্বাচনকে 'অবাধ ও নিরপেক্ষ' নয় বলে মন্তব্য করে। তবে আঞ্চলিক দুই শক্তিশালী দেশ ভারত ও চীন তাৎক্ষণিকভাবে ৭৬ বছর বয়সি এই নেতা ও তার মন্ত্রিসভাকে অভিনন্দন জানায়। ভারতের প্রধানমন্ত্রী হাসিনার এই জয়ের বিশেষভাবে প্রশংসা করেন। যদিও গবেষণা সংস্থাগুলোর বিবেচনায় এ নির্বাচন ছিল 'নিষিদ্ধ ও বয়কটের ভোট'। তবে মোদি সেসব বিশ্লেষণে না গিয়ে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী ও জনগণকে অভিনন্দন জানান।

এক্স হ্যান্ডেলে (সাবেক টুইটার) দেওয়া এক পোস্টে মোদি বলেন—'একটি সফল নির্বাচন আয়োজনের জন্য আমি বাংলাদেশের জনগণকে অভিনন্দন জানাতে চাই। আমরা বাংলাদেশের সঙ্গে জনগণকেন্দ্রিক সম্পর্ক ও অংশীদারত্ব আরও জোরদার করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।'

যদিও এই বক্তব্য ছিল বাস্তবতা থেকে সম্পূর্ণই ভিন্ন। *দ্য কর্নেল হু উড নট রিপেন্ট : দ্য বাংলাদেশ ওয়ার অ্যান্ড ইটস আনকোয়াইট লিগ্যাসি* শীর্ষক বইয়ের লেখক সলিল ত্রিপাঠি এর ব্যাখ্যা দিয়ে বলেন—'ভারত হাসিনায় অতিরিক্ত বিনিয়োগ করে ফেলেছে; বাংলাদেশে তাদের বিনিয়োগ কম।'

'কাজেই নয়াদিল্লি তার সব ডিম এক ঝুড়িতেই রেখেছিল। ভূ-কৌশলগতভাবে যা একেবারেই বুদ্ধিমানের কাজ না।'

চীন-ভারতের কূটনৈতিক চাপ সামাল দেওয়া

কুগেলম্যান মনে করেন, হাসিনা এমন কিছু কূটনৈতিক কৌশল অনুসরণ করেছেন, যা আঞ্চলিক শক্তিশালী রাষ্ট্রগুলোকে সন্তুষ্ট রাখতে সক্ষম ছিল। তিনি বলেন—'আপনি হাসিনা সম্পর্কে অনেক কিছুই বলতে পারেন। তবে আমি মনে করি, আঞ্চলিক শক্তিগুলোর সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্কের ভারসাম্য বজায় রেখে চলতে পেরেছেন তিনি। ভারতের সঙ্গে তার একটি বিশেষ সম্পর্ক ছিল। তবে চীনের সঙ্গেও তিনি অর্থনৈতিক ও প্রতিরক্ষা খাতে সম্পর্ক বাড়িয়েছেন।'

গত বছর মার্চ মাসে হাসিনা বাংলাদেশের কক্সবাজার উপকূলে ১.২১ বিলিয়ন ডলার ব্যয়ে নির্মিত সাবমেরিন ঘাটির উদ্বোধন করেন। এর সম্পূর্ণ অর্থায়ন করে চীন। ওয়াশিংটন ডিসি-ভিত্তিক স্ট্র্যাটেজিক অ্যান্ড ইন্টারন্যাশনাল স্টাডিজের দৃষ্টিতে এটা ছিল সাবমেরিন কূটনীতি।

তবে চীন-ভারতের এই কূটনৈতিক সম্পর্ক সামাল দেওয়াও খুব সহজ কাজ নয়। বাংলাদেশে ১৪ বছর এককভাবে সর্বোচ্চ ক্ষমতাশালী থাকার পরও হাসিনার অবস্থানে কিছুটা ফাটল ধরে। ভারতের সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদন অনুসারে, গত মাসে তার চীন সফর পুরোপুরি ব্যর্থ হয়। সেবার হাসিনার ব্যাপারে খুব একটা আগ্রহ দেখায়নি বেইজিং। তিস্তা নদীর পানি ব্যবস্থাপনা প্রকল্পে অর্থায়নের জন্য চীন সফর করেছিলেন হাসিনা। তবে তার সেই উদ্দেশ্য সফল হয়নি। ফলে হাসিনা তার চীন সফর সংক্ষিপ্ত করে ফেলেন। দেশে গিয়ে সাংবাদিকদের জানান, তিস্তা পানি প্রকল্পের জন্য ভারতের প্রস্তাবই তার বেশি পছন্দ হয়েছে।

বাংলাদেশকে 'বিক্রি'

ঐতিহাসিকভাবেই দিল্লির সঙ্গে ঢাকার সুসম্পর্ক রয়েছে। বাংলাদেশ একসময় পূর্ব পাকিস্তান ছিল। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তানের অংশ হিসেবে ব্রিটিশ উপনিবেশ থেকে স্বাধীন হয় তারা। ১৯৪৭ সালে হিন্দু সংখ্যাগুরু ভারত ও মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ পাকিস্তান স্বাধীনতা লাভ করে।

বাংলাদেশের জন্ম হয় ১৯৭১ সালে। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা যুদ্ধে বাংলাদেশকে ভারতের সেনাবাহিনী সহায়তা করে।

সত্তরের দশক থেকে পাকিস্তান ও চীনের সঙ্গে কূটনৈতিক দ্বন্দ্বের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের সহযোগিতা পেয়েছে ভারত। সীমান্ত নিয়ে চীন ও পাকিস্তানের সঙ্গে সংঘাত ভারতের জন্য একটি নিয়মিত ঘটনা।

ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের সঙ্গে বাংলাদেশের ভাষাগত সাদৃশ্য রয়েছে। ভারত বরাবরই তার পূর্বাঞ্চলীয় প্রতিবেশীর সঙ্গে বেশ উষ্ণ সম্পর্ক বজায় রেখে চলেছে।

২০১৪ সালে হিন্দু জাতীয়তাবাদী বিজেপি ক্ষমতায় আসার পর পরিস্থিতি বেশ জটিল হয়ে যায়। ২০১৯ সালে মোদি সরকার একটি বিতর্কিত নাগরিক আইন পাস করে। এই আইনটি মুসলিমবিদ্বেষী হিসেবে তীব্রভাবে সমালোচিত হয়। বিজেপির নেতারা সব মুসলমানকে অনুপ্রবেশকারী হিসেবে অভিহিত করে। দেশটির কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ পশ্চিমবঙ্গে এক নির্বাচনী জনসভায় ভাষণ দেওয়ার সময় বাংলাদেশিদের উইপোকা বলেও সম্বোধন করেন।

২০২১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষ্যে মোদি ঢাকায় যান। এ সময় মোদিবিরোধী বিক্ষোভে ১২ জন নিহত হয়, যা হাসিনার প্রশাসনের জন্য চরম বিব্রতকর ছিল।

জানুয়ারির নির্বাচনে হাসিনার জয়ের পর বাংলাদেশজুড়ে একটি 'ইন্ডিয়া আউট' প্রচার শুরু হয়। এই প্রচারের মূল লক্ষ্য ছিল ভারতীয় পণ্য বর্জন। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এই প্রচার ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতা পায়। ঢাকার দোকানদাররা গত ফেব্রুয়ারিতে ভয়েস অব আমেরিকাকে জানান, ভারতের বেশ কিছু পণ্যের বিক্রি পড়ে গেছে।

বহু সমালোচক মনে করেন, হাসিনার জয়ে ভারতের হাত রয়েছে। যদিও তা গোপনে। আবার অনেকে এমনও বলেন, বাংলাদেশের নির্বাচন নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপের উদ্‌বেগ দমাতে নিজের প্রভাব ব্যবহার করেছে ভারত। যদিও ভারত এসব অভিযোগ স্বীকার করেনি।

মোদির মুসলিমবিদ্বেষী অবস্থানের জন্য বাংলাদেশে তার ব্যাপারে ক্ষোভ রয়েছে। তবে তারপরও হাসিনা মোদির সঙ্গে চমৎকারভাবে কাজ করার মতো সম্পর্ক বজায় রেখে চলেছেন। ভারতে ২০১৯ সাল থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত বিজেপির নেতাদের মুসলিমবিদ্বেষী ও বাংলাদেশি অভিবাসীবিরোধী মন্তব্য বাড়তে থাকলেও হাসিনা এ ব্যাপারে নীরবতা পালন করেন। এ বিষয়টিকে তিনি বরাবরই দেখেছেন ভারতের 'অভ্যন্তরীণ' বিষয় হিসেবে।

অর্থাৎ, দুই নেতাই পরস্পরের মানবাধিকার লঙ্ঘন ও গণতন্ত্রের পশ্চাদপসরণের ঘটনাগুলো এড়িয়ে গেছেন। যা হাসিনা-মোদির সম্পর্কে স্থিতিশীলতা ও গতিশীলতা বাড়িয়েছে।

ঢাকা-দিল্লির মধ্যে এ সময়ে নিরাপত্তা ও প্রতিরক্ষা সহযোগিতাও বেড়েছে। বিশেষ করে বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী ভারতের সহিংসতাকবলিত উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলো শান্ত হয়েছে।

বেড়েছে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য। ভারতের সহযোগিতায় বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ চুক্তিও সই হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে হাসিনা সরকার এবং ভারতের বিলিয়নিয়ার গৌতম আদানির আদানি গ্রুপের মধ্যে সই হওয়া কয়লা চুক্তি। এই গ্রুপের সঙ্গে মোদির বিশেষ সুসম্পর্ক রয়েছে।

ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার কয়েক সপ্তাহ আগে হাসিনাকে তার ২১-২২ জুন ভারত সফরের প্রসঙ্গ তুলে প্রশ্ন করা হয়, তিনি দেশ ভারতের কাছে বেচে দিয়েছেন কি না। জবাবে তিনি বলেন—'শেখ হাসিনা দেশ বেচে না।' তিনি তার অতীত ট্র্যাক রেকর্ড ঘেঁটে দেখার পরামর্শ দেন সাংবাদিকদের।

সংখ্যালঘুদের ঠিক ও বেঠিক

দক্ষিণ এশিয়া-বিষয়ক বিশ্লেষকরা ভারত প্রসঙ্গে নিয়মিত একটি বিষয় উল্লেখ করেন, ভারত তার প্রতিবেশীদের সঙ্গে সম্পর্কের ব্যাপারে সংখ্যালঘুদের অধিকার সুরক্ষার বিষয়টি বিশেষভাবে লক্ষ করে। এটা শ্রীলঙ্কার ক্ষেত্রে তামিলদের প্রসঙ্গ হতে পারে অথবা বাংলাদেশের ক্ষেত্রে হিন্দু।

তবে ত্রিপাঠি মনে করেন, মোদি প্রশাসনের হিন্দু রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সংকল্প ভারতের মূল পররাষ্ট্রনীতিকে বেশ প্রভাবিত করেছে। তিনি বলেন—'হিন্দুদের সঙ্গে বাংলাদেশে কেমন আচরণ করা হয়—বিষয়টি ভারতের জন্য রেডলাইনে পরিণত হয়েছে। তারা এই বিষয়টি নিয়ে এমনভাবে কথা বলে, যেন এটাই নয়াদিল্লির দীর্ঘদিনের বৈধ অবস্থান। আমি একটি বিষয় বুঝতে অক্ষম, দিল্লি কী করে তার নিজ দেশের সংখ্যালঘু মুসলিমদের সঙ্গে রাষ্ট্রের আচরণের কথা ভুলে যায়!'

বাংলাদেশি বিশ্লেষকরাও ভারতের এ অবস্থানের কথা খুব ভালো করে জানেন। তবে এখন তাদের মূল মনোযোগ তাদের দেশের ভবিষ্যতের ওপর। যদিও দেশটির বর্তমান পরিস্থিতি অত্যন্ত গুরুতর।

মুনির বলেন—'বাংলাদেশের জন্য স্থিতিশীলতা, অর্থনৈতিক উন্নয়ন, বৃহৎ প্রতিবেশীর সঙ্গে স্বাস্থ্যকর সম্পর্ক অত্যন্ত জরুরি।'

তিনি আরও বলেন—'বাংলাদেশের বেশিরভাগ মানুষ ভারতের সঙ্গে একটি শক্তিশালী, গঠনমূলক, উৎপাদনমুখী সম্পর্ক চায়। তারা আমাদের সর্ববৃহৎ প্রতিবেশী এবং ভূরাজনৈতিক ও ভৌগোলিকভাবেই আমাদের মধ্যে বাস্তবসম্মত ও সক্রিয় সম্পর্ক রয়েছে। রাজনৈতিক পরিবর্তনের কারণে এই সম্পর্ক জিম্মি হতে পারে না।'

তিনি আরও যোগ করেন—'তবে সে ক্ষেত্রে দিল্লিকে অবশ্যই তার বাংলাদেশ নীতিতে পরিবর্তন আনতে হবে। ঢাকা সম্পর্কে দিল্লি এক ব্যক্তি বা এক সরকারকেন্দ্রিক যে ধারণা তৈরি করে রেখেছে, তাতে পরিবর্তন আনা অপরিহার্য। ঢাকাকে এই বার্তা দিল্লির দিতে হবে। বিষয়টি অত্যন্ত জরুরি। তাদের মেনে নিতে হবে যে, বিপ্লব হয়েছে। তাদের মেনে নিতে হবে, শেখ হাসিনা এখন ইতিহাস।'

এদিকে শেখ হাসিনার ভারতে অবস্থানও ঢাকা-দিল্লির সম্পর্কের ক্ষেত্রে একটি অন্তরায় সৃষ্টি করতে পারে। ছাত্র-জনতার আন্দোলনের মুখে ৫ আগস্ট পদত্যাগ করে ভারতে পালিয়ে যান হাসিনা।

বিশ্লেষকরা বলছেন, ভারতের পক্ষে হাসিনার নির্বাসনের অনুরোধটি নাকচ করা সম্ভব ছিল না। কারণ, সে ক্ষেত্রে বার্তা দেওয়া হতো যে, বিপদে পড়লে সহযোগীদের সহায়তা করে না দিল্লি।

ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে প্রত্যাবাসন চুক্তি রয়েছে। এর অর্থ হচ্ছে, ঢাকা যদি শেখ হাসিনাকে ফিরিয়ে নেওয়ার জন্য অনুরোধ করে তাহলে ভারতকে এটা মেনে নিতে হবে। অন্যথায় আন্তর্জাতিক একটি চুক্তি ভাঙার দায়ে অভিযুক্ত হতে পারে তারা।

কয়েকজন বিশ্লেষক মনে করেন, হাসিনা সংকটের সবচেয়ে সহজ সমাধান হতে পারে তাকে তৃতীয় কোনো দেশে পাঠিয়ে দেওয়া। এটা উপসাগরীয় কোনো দেশ হতে পারে; যার সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক ভালো।

তবে বাংলাদেশের ছাত্র আন্দোলনে অংশ নেওয়া অনেকেই মনে করেন, দেশে ফিরতে পারেন হাসিনা। তরুণদের অনেকেই একে দেখছেন হুমকি হিসেবে।

(নিবন্ধের শুরুতে উল্লেখ করা) তরুণ বলেন—'আমি আমার পরিচয় এখনও প্রকাশ করিনি। কারণ, এখনও আমার নিরাপত্তা ঝুঁকি রয়েছে। শেখ হাসিনা পালিয়ে গেছেন। তবে তার দলের অনেক মানুষ, তার দলের ছাত্রসংগঠনের অনেকে এখনও দেশে। তারা পালিয়ে যাওয়ার সুযোগ পায়নি। তারা এখনও আমাদের দিকে নজর রাখছে।'

বাংলাদেশের সামনের পথ বেশ কঠিন। হাসিনার পদত্যাগের ১০ দিন পার হয়ে গেছে। ঢাকার পরিস্থিতি এখনও স্বাভাবিক নয়। বৃহস্পতিবার ছিল ১৫

আগস্ট। ১৯৭১ সালের এই দিনেই এক সামরিক অভ্যুত্থানে হাসিনার বাবা শেখ মুজিবুর রহমান সপরিবারে নিহত হন।

ঢাকায় ওই দিন হাজারো ছাত্র ও রাজনৈতিক কর্মীরা বাঁশের লাঠি, লোহার রড ও পাইপ হাতে শেখ মুজিবের সাবেক বাসভবনে যেতে হাসিনার সমর্থকদের বাধা দেয়।

বিপ্লবের পর রক্তাক্ত প্রতিবিপ্লবের আশঙ্কা থেকে যায়। অনেক সময় মানবাধিকার বা গণতন্ত্রের মতো যেসব আকাঙ্ক্ষা নিয়ে বিপ্লব ঘটানো হয়েছিল, তা পূরণ হতেও লম্বা সময় লেগে যায়।

তবে তরুণটি বাংলাদেশের ভবিষ্যতের ব্যাপারে আশাবাদী। তিনি বলেন— 'বাংলাদেশের ছাত্রদের একটি উজ্জ্বল ও কল্যাণকর ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করাই ছিল এই বিক্ষোভের মূল উদ্দেশ্য। আমরা আশাবাদী! বাংলাদেশে যা ঘটছে, তা নিয়ে আমরা এই আশাবাদ ধরে রাখব। আমরা সবাই আমাদের উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর ভবিষ্যতের অপেক্ষায় আছি।'

পানি লাগবে
পানি!
GEN-Z
RIYA
DIPTO
SHANTO
FAHAD
ABU SAYED
PRIYO
FARHAN
FAIYAZ

বাংলাদেশে প্রধানমন্ত্রীর পতনের পর দেশের শাসন পদ্ধতির খোঁজে জেন-জি

npr

(১৬ আগস্ট, ২০২৪ তারিখে এনপিআর-এ *আফটার আউস্টিং বাংলাদেশ'স লিডার, জেন-জি প্রোটেস্টারস আর ফিগারিং আউট হাউ টু গভর্ন* শিরোনামে প্রতিবেদনটি প্রকাশিত হয়। লিখেছেন দিয়া হাদিদ ও আহমেদ হুসেইন।)

এক কিশোর স্কাউট। গলায় রুমাল বাঁধা। এলোমেলো এক ট্রাফিক সিগনালে তিনবার বাঁশি বাজিয়ে গাড়ি থামানোর চেষ্টা করছে। একটা অ্যাম্বুলেন্স ছুটে আসছে। মাইক হাতে এক ব্যক্তি নির্দেশনা দিচ্ছেন—'স্বেচ্ছাসেবীরা! যে যার জায়গায় ফিরে যাও।'

চার রাস্তার মাথায় অন্তত ডজনখানেক শিক্ষার্থী। লাঠি আর বাঁশি নিয়ে মোটরসাইকেল, গাড়ি, রিকশা আর ডাবলডেকার সামাল দেওয়ার চেষ্টা করছে। এর মধ্যেই চলে যাচ্ছে অ্যাম্বুলেন্স।

ঢাকা শহরের একটি স্বাভাবিক দৃশ্য এটি। বারবার চোখে পড়ে। এ শহরে এক কোটিরও বেশি মানুষ বাস করে। তরুণ, মাদরাসা শিক্ষার্থী, হিজাব পরা নারী, মেয়ে স্কাউট সবাই এখন ব্যস্ত রাস্তার ট্রাফিক সামাল দিতে। তারা পথচারীদের নিরাপদ রাখারও চেষ্টা করে।

স্কুল-কলেজের শিক্ষার্থী আর কিশোর-কিশোরীরা মিলে বাংলাদেশের স্বৈরশাসক প্রধানমন্ত্রী হাসিনাকে ক্ষমতাচ্যুত করার এক সপ্তাহ পার হয়েছে মাত্র। এই প্রজন্মকে বলা হচ্ছে জেনারেশন জেড বা জেন-জি। এখন তারাই সবকিছুর দায়িত্ব নিতে চাইছে।

৫ আগস্ট প্রধানমন্ত্রী পদত্যাগ করার পর পুলিশ কর্মবিরতি পালন করছে। ফলে ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিয়েছে এসব স্বেচ্ছাসেবী।

এর আগে ছাত্র আন্দোলন শক্ত হাতে দমনের চেষ্টা করে পুলিশ। ওই আন্দোলনে কয়েকশ মানুষ নিহত হয়। ওই আন্দোলন একপর্যায়ে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীকে পদত্যাগ করতে বাধ্য করে। তিনি বাংলাদেশের সবচেয়ে বেশি দিন ক্ষমতায় ছিলেন।

কয়েক দিন পার করে রাজধানী ঢাকায় পুলিশ কাজে ফিরতে শুরু করেছে। তবে তার আগেই দায়িত্ব কাঁধে তুলে নেয় শিক্ষার্থীরা। তাদেরই একজন সেজওয়ানা আহমেদ শ্রেষ্ঠা। বয়স বিশের কোঠায়। তার আশা, ভবিষ্যতে ব্যবসায় প্রশাসনে লেখাপড়া করবেন। তবে তার আগেই ঢাকার অনিয়ন্ত্রিত ট্রাফিকব্যবস্থাকে শৃঙ্খলায় ফেরানোর দায়িত্ব কাঁধে তুলে নেন তিনি। মোটরসাইকেল আরোহীদের সম্পর্কে তিনি বলছিলেন—'ছাত্রদের কারণেই স্বাধীন হয়েছে বাংলাদেশ। কাজেই তারা আমাদের কথা শোনে।' বলতে বলতেই একপাশে সারি বেঁধে দাঁড়ানো রিকশাচালকদের লাঠির ইশারায় পেছনে সরে যেতে বললেন তিনি।

এখন শিক্ষার্থীদের দেখা হচ্ছে সুপারস্টারের দৃষ্টিতে। সাদা অ্যাপ্রোন পরা এক চিকিৎসাকর্মীকে দেখা গেল সড়ক বিভাজিকায় দাঁড়িয়ে কুপন বিলাতে। গোল্ডেন হার্ভেস্ট নামে এক কোম্পানির ডিস্ট্রিবিউটর শিক্ষার্থীদের মধ্যে কমলা ও সবুজ রঙের ছাতা বিলি করছেন।

শহরজুড়ে ফুটপাথের পাশ দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা দেয়ালে একদল তরুণ-তরুণী গ্রাফিতি আঁকছে। তাতে ফুটে উঠছে তাদের আন্দোলন চলাকালীন নানা মুহূর্তের ছবি। মুমতাহিনা মুমু মিতি নামে ১৯ বছর বয়সি এক শিক্ষার্থী, তার বোন ও বন্ধুরা মিলে একটি দেয়ালে বাংলাদেশের পতাকা আঁকছেন। সবুজের মাঝে লাল সূর্য। তিনি একটু হেসে বললেন—'এই শহর তরুণদের শহর।' বাংলাদেশের এক-চতুর্থাংশ মানুষের বয়স ১০ থেকে ২৪-এর মধ্যে। এরাই প্রতিনিধিত্ব করছে জেন-জির। আমরা শুধু ফেসবুক, ইউটিউব আর ইন্সটাগ্রামের প্রজন্ম নই। আমরা আমাদের দেশকেও ভালোবাসি। আমরা আমাদের দেশের পুনর্গঠনের জন্য কাজ করতে চাই।' তাদের প্রজন্মের দেয়াল লিখনের কথা বলতে গিয়ে মিতি জানান—'বাংলাদেশি হও।'

গলিপথ থেকে শুরু করে স্কুলের দেয়াল—রঙের আঁচড় থেকে বাদ পড়েনি কোনো জায়গা। ১৬ বছর বয়সি মিম ও তার বন্ধুরা হাত থেকে রঙের দাগ মোছার চেষ্টা করছিল। তবে দাগ না উঠে তা আরও ছড়িয়ে পড়ে ওদের হিজাব আর বোরখায়।

ওরা পরীক্ষার প্রস্তুতি বাদ দিয়ে গ্রাফিতি আঁকছিল। একটা দেব শিশুর দু-পাশে দুটি পাখা। মীর মুগ্ধকে সম্মান দেখিয়ে এ ছবি আঁকার চেষ্টা তাদের। আন্দোলন চলার সময় বিক্ষোভকারীদের মধ্যে পানি বিলাতে গিয়ে পুলিশের গুলিতে নিহত হন মুগ্ধ। মিম বলছিল—'মানুষ যখন এ রাস্তা দিয়ে যাবে, আমাদের আঁকা ছবি সবার চোখে পড়বে। তারা সবাই মুগ্ধকে স্মরণ করবে।' মুগ্ধের সঙ্গে সম্ভবত বাকি শহিদদেরও স্মরণ করবে মানুষ। তাদের সবার আত্মত্যাগ একটি গণতান্ত্রিক দেশ প্রতিষ্ঠার জন্য। তারা এমন এক স্বৈরাচারীকে ক্ষমতা থেকে সরিয়ে দিয়েছে, যে নারী নিজ থেকে কখনও ক্ষমতা ছাড়ার কথা ভাবেননি।

হাইস্কুলের সিনিয়র শিক্ষার্থীদের নেতৃত্বে ভারতীয় হাই কমিশন পরিচালিত ইন্দিরা গান্ধী কালচারাল সেন্টার পরিষ্কারের কাজ চলছিল। হাসিনা পদত্যাগ করে ভারতে পালিয়ে যাওয়ার পর বিক্ষোভকারীরা এটি জ্বালিয়ে দেয়। তারা সম্ভবত ভারতের হাসিনাকে আশ্রয় দেওয়ার সিদ্ধান্ত মানতে পারেনি।

হাইস্কুলের ছাত্র ফুয়াদ খান বলছিল—'আমরা এ ধরনের ভাঙচুর এবং ব্যক্তিগত সম্পদের ক্ষতি করার পক্ষে নই। আমরা এগুলো পরিষ্কার করতে সাহায্য করছি। যত দ্রুত সম্ভব এটি পুনর্নির্মাণ করা হবে।'

শেখ হাসিনার শৈশবের বাসভবনও পুড়িয়ে ফেলা হয়েছে। সেই ভবনের সামনেও কয়েকজন দাঁড়িয়ে পাহারা দিচ্ছে। হাসিনার বাবা শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭১ সালে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে নেতৃত্ব দেন। তাকে একজন নায়কের সম্মান দেওয়া হয়। তবে এখন তার মর্যাদা তার কন্যার সঙ্গে ধুলোয় মিশে গেছে।

শেখ মুজিবের এই বাড়ি একসময় জাদুঘরে রূপান্তর করা হয়। এই বাড়ির সড়কটিও পাহারা দিচ্ছিল স্কাউটরা। তারা পথচারীদের কাগজপত্র পরীক্ষা করে দেখছে। যদিও কোনো ব্যবস্থা নেওয়ার এখতিয়ার তাদের নেই। টহল সেনারা এ ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত দিয়ে থাকে।

বাংলাদেশে এখন ক্ষমতায় কে আছে তা নিয়ে সংশয় রয়েছে। একটি অন্তর্বর্তীকালীন সরকার দায়িত্ব নিয়েছে আবার সেনাবাহিনীকেও দেখা যাচ্ছে। শিক্ষার্থীদের চাপে অন্তর্বর্তী সরকার গঠন করা হয়। যার দায়িত্ব নেন নোবেলবিজয়ী অর্থনীতিবিদ ড. ইউনূস। এই অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের উপদেষ্টা পরিষদে দুজন শিক্ষার্থীও রয়েছেন। তাদের বয়স মাত্র ২৬ বছর।

এই সরকারের সামনে এখন বিশাল দায়িত্ব। তারা আইনের কিছু মৌলিক সংস্কার করবেন। যেন ভবিষ্যতে কোনো প্রধানমন্ত্রী স্বৈরাচারীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে না পারে। এ ছাড়াও তাদের পুলিশ বাহিনীকে পুনর্গঠন করতে হবে। সমস্যা রয়েছে নিত্যপণ্যের মূল্য ও বেকারত্ব নিয়ে, বিশেষ করে তরুণ সমাজে। উচ্চশিক্ষিত তরুণদের একটা বড়ো অংশই বেকার। এবং অবশ্যই এ সরকারকে পরবর্তী নির্বাচন আয়োজন করতে হবে। এই অংশটাই সবচেয়ে কঠিন। এমনকি সরকারের সমর্থকরা বিষয়টা নিয়ে উদ্‌বিগ্ন যে, তারা কাজটি করতে পারবে কি না।

সাম্প্রতিক ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, যেসব বিপ্লব তরুণরা ঘটিয়েছে, তার অধিকাংশই ভয়াবহভাবে ভুলপথে হোঁচট খেয়েছে। মানবাধিকার কর্মী শহীদুল আলম বলেন—'এটা একটা কঠিন সময়। এটা এমন একটি পালাবদল, যা আগে আমাদের কেউই কখনও দেখেনি। আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি, এর জন্য যে দক্ষতা প্রয়োজন, তা তাদের নেই। শুধু এই উপদেষ্টা কমিটির নেই তা নয়। এর বাইরে যারা আছেন, তাদেরও নেই।' তিনি আরও বলেন—'তবে জাতি হিসেবে আমরা ব্যর্থ হতে পারি না। এটা ইতিহাসের এমন একটি মুহূর্ত, যার পুনরাবৃত্তি হবে না।'

বাংলাদেশে ক্ষমতাসীন ও আন্দোলনকারীদের সামনে কঠিন পথ

THE WALL STREET JOURNAL.

(ওয়াল স্ট্রিট জার্নালে ২১ আগস্ট, ২০২৪ *বাংলাদেশ'স প্রটেস্টার টেক পাওয়ার অ্যান্ড ফাইন্ড গভর্নিং ইজ'ন্ট ইজি* শিরোনামে এই প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। লিখেছেন কৃষ্ণা পোখারেল, জন ইমন্ত ও মুকতাদির রশিদ)

গাজা যুদ্ধ নিয়ে তিন মাস আগে অনলাইনে পোস্ট দিয়েছিলেন ২৬ বছর বয়সি নাহিদ ইসলাম। একটি পাঠচক্রে আলোচনার জন্য অনুসারীদের আহ্বান জানিয়েছিলেন তিনি। সমাজবিজ্ঞানের এই শিক্ষার্থী এখন বাংলাদেশের প্রযুক্তি ও টেলিকম মন্ত্রী। দেশটির দীর্ঘদিনের শাসক শেখ হাসিনার পতনের আন্দোলনের অন্যতম নেতা তিনি। ১৭ কোটি মানুষের দেশটির অন্যতম নীতিনির্ধারণী ব্যক্তি।

নাহিদসহ বাকি আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীরা ড. মুহাম্মদ ইউনূসকে অন্তর্বর্তী সরকারের দায়িত্ব নেওয়ার জন্য অনুরোধ করেন। ৮৪ বছর বয়সি এই ক্ষুদ্রঋণ ব্যবস্থার প্রবর্তক ও নোবেলজয়ী ব্যক্তি শিক্ষার্থীদের দাবির কাছে নতিস্বীকার করেন। তার নেতৃত্বে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠিত হয়।

অন্তর্বর্তীকালীন সরকারে শিক্ষার্থীদের তরফ থেকেও দুইজনকে প্রতিনিধি করা হয়। উপদেষ্টা পদের জন্য স্বাভাবিকভাবেই নাহিদকে বেছে নেওয়া হয়। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর পর্যায়ের শিক্ষার্থী। কয়েক সপ্তাহ ধরে চলা আন্দোলনের অন্যতম পরিচিত মুখ তিনি। জুলাই মাসে তাকে পুলিশ আটক ও নির্যাতন করার পর আরও পরিচিত হয়ে ওঠেন।

তবে তার কাজ খুব সহজ হচ্ছে না। নতুন সরকারের কাছে স্রোতের মতো আছড়ে পড়ছে বিভিন্ন ধরনের দাবিদাওয়া। নাহিদ বলেন—'আমার ঘাড়ের ওপর অনেক বড়ো দায়িত্ব পড়েছে।' প্রতিদিন ১৬ ঘণ্টা করে কাজ করছেন জানিয়ে তিনি বলেন—'মানুষ তাদের সমস্যা নিয়ে আসে। বহু সমস্যা।'

সম্প্রতি এক বিকেলে নাহিদের সাত তলা প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের অফিস থেকে শোনা যাচ্ছিল, এক দফা দাবির স্লোগান। অনেকটা হাসিনার পদত্যাগের দাবিতে শিক্ষার্থীদের যে 'এক দফা দাবি' ছিল তার মতোই। এখন বিভিন্ন গোষ্ঠী সরকারের কাছে আসছে তাদের নিজস্ব দাবি নিয়ে।

নাহিদ এসব দাবিকে দেখছেন কয়েকটি প্রজন্মের অপ্রাপ্তির লড়াই হিসেবে। এর একদিকে আছে ১৯৭১ সালে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে মুক্তিযুদ্ধকারীদের সন্তান এবং অন্যদিকে যারা ১৯৯০-এর দশক বা তার পর জন্মেছে তারা।

নাহিদ বলেন—'এখন একটি নতুন প্রজন্ম এসেছে। তারা নতুন মধ্যবিত্ত, উদীয়মান মধ্যবিত্ত এবং গ্রামীণ এলাকা থেকে উঠে আসা মানুষ। এরা ক্ষমতার অংশীদার হতে চায়।'

হাসিনা সরকারের শেষ দিনগুলোতে শিক্ষার্থীদের আন্দোলন দমন করতে প্রশাসন ইন্টারনেট বন্ধ করে দেয়, যেন শিক্ষার্থীরা সামাজিক মাধ্যম ব্যবহার করতে না পারে। শিক্ষার্থীদের আন্দোলন মূলত সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহার করেই গড়ে ওঠেছিল। সরকারি চাকরিতে কোটাব্যবস্থা পরিবর্তনের দাবিতে এ আন্দোলন গড়ে ওঠে। এই আন্দোলন একসময় সহিংস হয়ে ওঠে। একপর্যায়ে সরকারবিরোধী আন্দোলনে রূপ নেয়।

মধ্য জুলাই থেকে শুরু হওয়া এ আন্দোলনে পাঁচ শতাধিক মানুষ নিহত হয়। অতিসম্প্রতি পরিস্থিতি কিছুটা শান্ত হয়েছে।

তথ্য থেকে ইন্টারনেট সব দায়িত্ব এখন নাহিদের কাঁধে। তিনি জানালেন, এবারের সরকার অন্যরকম হবে। এর আগের সরকার মর্যাদাহানি ও মিথ্যা তথ্য ছড়ানোর অভিযোগে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন ব্যবহার করে বহু সাংবাদিক ও বিরোধী দলীয় কর্মীদের গ্রেফতার করেছে। তারা সে পথে হাঁটতে চান না।

তার বাবা বিরোধী দলীয় রাজনীতি করায় তাকেও বহুবার কারাগারে যেতে হয়েছে বলে উল্লেখ করে নাহিদ বলেন—'আমরা বাক্‌স্বাধীনতা ও গণমাধ্যমের স্বাধীনতায় সর্বোচ্চ অগ্রধিকার দেবো।'

নাহিদের আরেক সহযোদ্ধা ২৬ বছর বয়সি আসিফ মাহমুদ শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পেয়েছেন। যুব মন্ত্রণালয়ও তার অধীনে।

ঢাকার বহু মানুষ এখন নতুন বাংলাদেশের সম্ভাবনার ব্যাপারে আশাবাদী। তবে তাদের সামনে এখন অনেক চ্যালেঞ্জ। ইউনূস বা তার ছাত্রসমর্থকদের কারোরই দেশ পরিচালনার অভিজ্ঞতা নেই।

৫ আগস্ট হাসিনার পদত্যাগের পর ক্ষমতার শীর্ষে শূন্যতার সৃষ্টি হয়। পুলিশ ভয়ে পালিয়ে যায়। কারণ, আন্দোলন চলাকালে তারা ছাত্র-জনতার ওপর গুলি করেছে। সাবেক ক্ষমতাসীনদের বাড়িঘর, সম্পদ লুটপাট শুরু হয়। হিন্দু সংখ্যালঘুরাও হামলার শিকার হয়।

হিন্দুদের মন্দির রক্ষা থেকে শুরু করে ট্রাফিক ব্যবস্থাপনার মতো কাজগুলো ছাত্ররা নিজ দায়িত্বে সম্পাদন শুরু করে। বিক্ষোভে যাদের পরিবারের কেউ হতাহত হয়েছে, তাদেরও সাহায্য করে তারা।

গত সপ্তাহে আসাদ রনি নামে ২৮ বছর বয়সি এক যুবক আগস্টের বিক্ষোভে আহত এক ছাত্রের জন্য ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিটে একটি বেড পাওয়ার জন্য রাতভর দৌড়ঝাঁপ করে। আসিফ ও নাহিদের সহযোদ্ধা রনি।

ঢাকার একটি হাসপাতাল থেকে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় একটি ফোন পান রনি। ফোনে নিজেকে ছাত্র আন্দোলনের প্রধান সমন্বয়ক গ্রুপের একজন সদস্য দাবি করে তিনি এক আহত ছাত্রকে হাসপাতালে ভর্তি করে নেওয়ার জন্য কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ জানান। কয়েক মিনিটের মধ্যেই তাকে ফিরতি ফোনে জানানো হয়, ওই ছাত্রকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

সাম্প্রতিক দিনগুলোতে ঢাকায় পুলিশ আবার তাদের কাজে যোগ দিয়েছে। ফলে কিছুটা হলেও শৃঙ্খলা ফিরেছে। তবে দেশ পরিচালনার চ্যালেঞ্জ এখনও বিদ্যমান। কারণ, আগের প্রশাসনের শত শত স্থানীয় কর্মকর্তারা পালিয়ে গেছেন। তাদের শঙ্কা, প্রতিহিংসার শিকার হতে পারেন তারা।

অন্যদিকে ছাত্ররাও গুরুত্বপূর্ণ পদগুলো থেকে আগের প্রশাসনের কর্মকর্তাদের সরিয়ে দেওয়ার দাবি তোলে। এর মধ্যে সুপ্রিমকোর্টের প্রধান বিচারপতি থেকে শুরু করে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের গভর্নর ও শীর্ষ বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ভাইস চ্যান্সেলররাও রয়েছেন।

এর মধ্যে নেওয়া পদক্ষেপগুলোর ব্যাপারে সাফাই দিয়েছেন ড. ইউনূস। বলেছেন—'যথাযথ আইনগত ব্যবস্থাও শীঘ্রই নেওয়া হবে।'

অন্তর্বর্তীকালীন সরকার কতদিন ক্ষমতায় থাকতে পারবে, তা নিয়ে অনিশ্চয়তা রয়েছে। প্রধান রাজনৈতিক দলগুলো দ্রুত নির্বাচন দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছে। তবে এ ব্যাপারে তাড়াহুড়া করতে চান না ছাত্রনেতারা। এই সরকার এবং তাদের নেওয়া সিদ্ধান্তগুলো সাংবিধানিকভাবে কতটা বৈধ, তা নিয়েও আলোচনা শুরু হয়েছে।

ছাত্ররা যুক্তি দেখাচ্ছে, অন্তর্বর্তী সরকারের কাছে রাষ্ট্রপরিচালনার মতো যথেষ্ট ক্ষমতা রয়েছে। তারা তত্ত্বাবধায়ক সরকার নয়। তত্ত্বাবধায়ক সরকার শুধু নির্বাচন পরিচালনার কাজটি করে থাকে। অন্তর্বর্তীকালীন সরকার চাইলে আরও বড়ো ধরনের পরিবর্তন আনতে পারে।

ছাত্র আন্দোলনের সমন্বয়ক ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থী নুসরাত তাবাসসুম বলেন—'অন্তর্বর্তী সরকারকে বহু কিছু সংস্কার করতে হবে। যেমন আমাদের সংবিধান, আইনশৃঙ্খলা বাহিনী, হাইকোর্ট, সুপ্রিম কোর্ট, আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা, অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, স্বাস্থ্যব্যবস্থা ইত্যাদি।

বাংলাদেশের আরও সমস্যা রয়েছে; যেমন—বেকারত্ব, দুর্নীতি। এসব সংকটের দ্রুত কোনো সমাধান নেই। বহু সমস্যাই এখন বুদ্‌বুদের মতো উঠে আসছে। নতুন সরকার এসব সংকট ধৈর্য ধরে সমাধানের চেষ্টা করছে।

সাম্প্রতিক দিনগুলোতে সরকারি দপ্তরগুলোর সামনে বিক্ষোভকারীদের ভিড় বাড়ছে। সরকারি চাকরির প্রার্থীরা তাদের নিয়োগের দীর্ঘসূত্রিতা বাতিলের দাবি করছেন। এদিকে পার্লামেন্টও ভেঙে দেওয়া হয়েছে।

নাহিদ দায়িত্ব নিয়েছেন মাত্র দুই সপ্তাহ আগে। তবে তার দপ্তর এরই মধ্যে সাহায্যপ্রার্থীদের আবেদনে ভরে উঠেছে।

ফজলে রাব্বি একজন অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক। তার বয়স ৬২। নাহিদের দপ্তরের বাইরে দাঁড়িয়ে ছিলেন। তার আশা—দীর্ঘদিন থেকে বেতন পাওয়া নিয়ে যে সংকটের মধ্যে তিনি আছেন, তার সমাধান পাওয়া সম্ভব।

আবদুল মান্নানের বয়স ২৭। অ্যাপ ডেভেলপার। বলছিলেন, তথ্যপ্রযুক্তি খাতে কী করে তরুণদের আরও যুক্ত করা যায় সেই আইডিয়া তিনি নতুন সরকারকে দিতে চান।

আঞ্চলিক ইন্টারনেটকে আরও গতিশীল করার দাবি নিয়ে এসেছেন একদল ছাত্র। এ ছাড়া বাংলাদেশে দুর্নীতি, চাঁদাবাজিরও একটা সমাধান খুঁজে বের করতে হবে তাকে। তিনি কী পারবেন? ছাত্ররা তাকে 'ভাই' বলে সম্বোধন করেন। প্রথামাফিক 'স্যার' বলে ডাকেন না। নাহিদ মন দিয়ে তাদের কথা শোনেন। কিছু ক্ষেত্রে আশ্বাস দেন যে, তিনি বিষয়টি দেখবেন।

নাহিদের বর্তমান প্রাইভেট সেক্রেটারি আলাউল কবির। সরকারি চাকরিতে তার ১৪ বছর পার হয়ে গেছে। তার কাছে নাহিদের সহকারি হিসেবে কাজ করা অন্য ঝানু রাজনীতিকদের সঙ্গে কাজ করার চেয়ে অনেক বেশি স্বস্তির। তিনি বলেন—'সাধারণত দেখা যায় মানুষ নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য আসে। কিন্তু ছাত্ররা দেশের জন্য কাজ করছে।'

MAMA

পুলিশের বিরুদ্ধে বিক্ষোভকারী যখন বাংলাদেশের ট্যাংকম্যান

THE WALL STREET JOURNAL.

(*ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল*-এ ১৭ আগস্ট, ২০২৪ তারিখে প্রতিবেদনটি প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল *প্রোটেস্টার হু ফেসড অব এগেইনস্ট পুলিশ বিকামস বাংলাদেশ'স ট্যাংক ম্যান*।)

মে মাসে ২৩ বছর বয়সি ইংরেজি সাহিত্যের ছাত্র আবু সাঈদের গ্র্যাজুয়েশন প্রায় শেষদিকে ছিল। শেষদিনের ক্লাসের পর নিজের ও সহপাঠীদের অভিব্যক্তি নিয়ে একটি আবেগময় ফেসবুক পোস্ট দেন তিনি। যেখানে রঙিন হৃদয়ের চিহ্নও দেওয়া আছে। আরেকটি পোস্টে তিনি লিখেছেন— 'আলহামদুলিল্লাহ, বহু চড়াই-উৎরাই আর অনিশ্চয়তার পর... ।'

এর দুই মাস পর তার হত্যাকাণ্ডের ভিডিও ধারণ করেন স্থানীয় সাংবাদিকরা। এই ভিডিও ভাইরাল হওয়ার পরই বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে বাংলাদেশ। বিক্ষোভে নামে শিক্ষার্থীরা। তার চূড়ান্ত পরিণতি হিসেবে ৫ আগস্ট পদত্যাগ করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

ভিডিওতে দেখা যায়, ওই তরুণ দুদিকে দু-হাত ছড়িয়ে দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের গেটের বাইরে দাঁড়িয়ে দাঙ্গা পুলিশ তার দিকে গুলি ছুড়ছে। বাংলাদেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের রংপুর শহরের এই বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তেন আবু সাঈদ। একবার গুলি লাগার পর আবারও সোজা হয়ে দাঁড়ানোর চেষ্টা করেন তিনি। শটগান উঁচু করে গুলি চালায় পুলিশ।

১৬ জুলাই আবু সাঈদ নিহত হন। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, এরপরই সরকারি চাকরির জন্য আন্দোলন দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে পরিণত হয়। তাকে বিবেচনা করা হতে থাকে কর্তৃত্বপরায়ণ সরকারের বিরুদ্ধে

বিক্ষোভকারীদের প্রতীক হিসেবে। বেইজিংয়ে ১৯৮৯ সালে গণতন্ত্রপন্থি বিক্ষোভের সময় একজন মাত্র বিক্ষোভকারী ট্যাংকের সামনে দাঁড়িয়ে যান। তাকে ডাকা হয় ট্যাংকম্যান হিসেবে। আবু সাঈদ বাংলাদেশের ট্যাংকম্যান।

শেখ হাসিনার পতনের পর গঠিত অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব নেন নোবেলবিজয়ী ড. মুহাম্মদ ইউনূস। তিনি বলেন, দেশের 'দ্বিতীয় স্বাধীনতা' অর্জনের লড়াইয়ে বাংলাদেশিদের উদ্‌বুদ্ধ করেছিল আবু সাঈদের আত্মত্যাগ। তিনি হাসিনার পতনকে ১৯৭১ সালে পাকিস্তানের কাছ থেকে বাংলাদেশের স্বাধীনতার সঙ্গে তুলনা করেন। মধ্য জুলাই থেকে এই বিক্ষোভে অন্তত ৫০০ জন নিহত হয়। আবু সাঈদ প্রথমদিকে নিহত হওয়া শিক্ষার্থীদের অন্যতম।

বিক্ষোভকারীরা আবু সাঈদের মধ্যে এই আন্দোলনের প্রধান ইস্যুটি খুঁজে পায়—লাখো তরুণ শিক্ষিত হওয়ার পরও বেকার, বাংলাদেশের তাদের কথা বলার স্বাধীনতা নেই। দেশটির অর্থনীতি দ্রুত সম্প্রসারিত হচ্ছে। তবে সেখানে বেকারত্বের হারও দুই অঙ্কের সংখ্যায় অবস্থান করছে। অনেকের কাছেই সরকারি চাকরি উন্নত জীবনে প্রবেশের সবচেয়ে বড়ো সুযোগ।

২৪ বছর বয়সি সমাজবিজ্ঞানের শিক্ষার্থী মোহাম্মদ ইবরাহিম খলিল একই বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়েন। আবু সাঈদের সঙ্গেই থাকতেন তিনি। বলছিলেন—'প্রথমদিকে ও নিজেই একটা কিছু করতে চাইত, যেন তার পরিবারকে কিছুটা সাহায্য করা যায়। একপর্যায়ে এই ইচ্ছা অনেক বড়ো হয়ে যায়। এর মাঝেই বড়ো একটা বাধা দেখা দেয়। ও এই বাধাটাই ভাঙতে চেয়েছিল।'

আবু সাঈদরা নয় ভাই-বোন। একমাত্র তিনিই বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সুযোগ পান। রংপুর সদরের কাছে একটি গ্রামে মাটির বাড়িতে জন্ম আবু সাঈদের। বৃত্তি পেয়ে হাইস্কুলের পাঠ শেষ করেন সাঈদ। বৃত্তির পরিমাণ ছিল ৪৮ হাজার টাকা বা ৪০০ ডলার।

তার বাবা মোহাম্মদ মকবুল হোসেন একজন কৃষক। তিনি একটি গরু বিক্রি করে এবং এক টুকরো জমি বন্ধক দিয়ে আবু সাঈদের বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ার খরচ দেন। মকবুল হোসেন জানান, তার ছেলে পড়াশোনার বেশিরভাগ খরচই জোগাড় করেছেন ছাত্র পড়িয়ে। তিনি বলেন—'খুব কষ্ট করেছে ও। নিজের খরচ নিজেই জোগাড় করত।'

আবু সাঈদের পরিবার ও বন্ধুরা জানান, শান্তস্বভাবের তরুণ ছিলেন তিনি। রাজনীতিতে কখনও আগ্রহ দেখাননি। তবে স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে কাজ করতেন। শীতের সময় গরিব মানুষের মধ্যে কম্বল বিতরণ করতেন।

অন্য এক ছাত্রের সঙ্গে ভাগাভাগি করে একটি রুমে থাকতেন আবু সাঈদ। সেখানে গিয়ে দেখা যায়, তার পড়ার টেবিলে ছড়িয়ে রয়েছে নানা বই। এর মধ্যে আমেরিকান লেখক টনি মরিসনের *দ্য ব্লুয়েস্ট আই*-ও রয়েছে। রয়েছে ভারতীয় ঔপন্যাসিক অরুন্ধতী রায়ের *দ্য গড অব স্মল থিংস*। ছাত্র পড়ানোর জন্য তৈরি করা নোট। একটি কমা বা সেমিকোলনের ব্যবহারে কী করে বাক্যের অর্থ পালটে যেতে পারে, নোটটি সে বিষয়ে লেখা।

আবু সাঈদের বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের বন্ধুরা জানান, কোটা সংস্কার আন্দোলন শুরু হওয়ার পর তারা রাজধানী ঢাকার শিক্ষার্থীদের সামাজিক মাধ্যমে দেওয়া পোস্টগুলো দেখতেন। জুলাই মাসের শুরুর দিকে আদালতের নির্দেশে সরকারি চাকরিতে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের পরিবারের জন্য ৩০ শতাংশ পদ বরাদ্দ রাখার কথা বলা হয়।

বিষয়টি আবু সাঈদের নজর কাড়ে। তিনি ফেসবুকে একটি গ্রুপ খুলে সেখানে সমন্বয়ক হিসেবে কাজ শুরু করেন। সেখানে অনেকেই কোটাব্যবস্থা নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেন। তাদের দৃষ্টিতে এ ব্যবস্থা অন্যায্য, যা কেবল হাসিনার আওয়ামী লীগ সরকারকে সুবিধা দেবে। আওয়ামী লীগ ২০০৯ সাল থেকে ক্ষমতায় রয়েছে। শেখ হাসিনা বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতৃত্বদানকারী ব্যক্তি এবং দেশের প্রথম প্রেসিডেন্টের কন্যা।

১ জুলাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিক্ষোভ শুরু হয়। আবু সাঈদ তার নিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের নিয়ে একই দাবিতে আন্দোলন শুরু করেন। শুরুর দিকে মাত্র কিছু ছাত্র এতে যোগ দেয়। সমাজবিজ্ঞানের খলিল বলছিলেন— 'আবু সাঈদ একাই লড়ে যাচ্ছিল। সঙ্গে কয়েকজন বন্ধু ছিল মাত্র।'

অল্প সময়ের মধ্যেই আরও মানুষ তাদের সঙ্গে যোগ দেয়। রংপুরের বিক্ষোভ শুরুর দিকে শান্তিপূর্ণই ছিল। তবে আওয়ামী লীগের ছাত্রসংগঠন বিক্ষোভকারীদের ওপর চড়াও হলে সহিংসতার সূত্রপাত হয়। ১৪ জুলাই হাসিনা ছাত্রছাত্রীদের 'রাজাকার' বলে সম্বোধন করলে রাতারাতি পরিস্থিতি পালটে যায়। বাংলাদেশে স্বাধীনতাযুদ্ধে বিরোধিতাকারীদের 'রাজাকার' বলে ডাকা হয়। এটি অত্যন্ত ঘৃণিত শব্দ।

১৬ জুলাই সশস্ত্র পুলিশ বিশ্ববিদ্যালয়ের গেটে বিপুলসংখ্যক শিক্ষার্থীকে আটকে দেয়। এর মধ্যে কিছু শিক্ষার্থী পুলিশকে লক্ষ্য করে ইট ছুড়তে শুরু করে। শিক্ষার্থীরা জানান, এ সময় পুলিশ সতর্ক না করেই গুলি ছোড়ে।

আবু সাঈদের হত্যার তদন্ত করছেন রংপুর পুলিশের জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা সাইফুজ্জামান ফারুকি। তিনি বলেন, অন্তর্বর্তী সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পর ওই এলাকার দায়িত্বপ্রাপ্ত পুলিশ কর্মকর্তাদের সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হয়। তদন্ত কমিটি ফুটেজ বিশ্লেষণ ও প্রত্যক্ষদর্শীদের ইন্টারভিউয়ের পর শীঘ্রই এ ব্যাপারে প্রতিবেদন প্রকাশ করবে।

হাসিনা সরকারের পতনের আগে এই ঘটনায় যুক্ত দুই পুলিশ কর্মকর্তাকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হয়। এই দুই কর্মকর্তাই গুলি ছোড়ে। হত্যাকাণ্ডের একটি তদন্তও শুরু হয়।

পুলিশ গুলি ছুড়তে শুরু করলে বেশিরভাগ বিক্ষোভকারীই পালিয়ে বা লুকিয়ে যান। কিন্তু আবু সাঈদ একাই দাঁড়িয়ে ছিলেন। তিনি চিৎকার করে বাকিদেরও তাদের জায়গায় অবস্থান করতে বলছিলেন। এর মাত্র একদিন আগে তিনি এক ফেসবুক পোস্টে স্বাধীনতাযুদ্ধে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর গুলিতে নিহত এক অধ্যাপকের কথা উল্লেখ করেন। শিক্ষার্থীদের বাঁচাতে ওই শিক্ষক তার জীবন দিয়েছিলেন। আবু সাঈদ লেখেন—'আপনার কবর আমাদের প্রেরণা জোগায়।'

ভিডিওতে দেখা যায়, প্রথম বুলেট শরীরে বিদ্ধ হওয়ার পর আবু সাঈদ টলে উঠলেন। এর কিছুক্ষণ পর আরও কয়েকটি বুলেট তার শরীরে লাগে। তিনি পড়ে যান। আরেকজন ছাত্র এসে তাকে সরিয়ে নিয়ে যান।

কয়েকজন বিক্ষোভকারী আবু সাঈদকে রিকশায় করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন বলে তার বন্ধুরা জানান। তবে হাসিনার সমর্থকরা লাঠি ও রামদা নিয়ে ওই রিকশায় হামলা চালায়। প্রত্যক্ষদর্শী ছাত্রদের কাছ থেকে জানা গেছে এ তথ্য।

আবু সাঈদের সহপাঠী ২৩ বছর বয়সি বেলাল হোসেন বলেন—'আমাদের মনে হয়েছে, ওরা আবু সাঈদকে হত্যা করতে এসেছে।' আন্দোলনে বেলালও হাতে গুলিবিদ্ধ হন।

আরেক সহপাঠী জান্নাতুন নাইম শেফা আরও কয়েকজন বন্ধুকে নিয়ে হাসপাতালে যান। হাসপাতালে নেওয়ার পথেই আবু সাঈদের মৃত্যু হয়। শেফা বলেন—'ওর শরীরে প্রচুর ছিদ্র ছিল। অনেকটা চালুনির মতো দেখাচ্ছিল।'

হত্যার কারণ লুকাতে পুলিশ আবু সাঈদের লাশ নিয়ে যেতে পারে এই আশঙ্কায় কয়েকজন ছাত্র তার লাশবাহী স্ট্রেচার ধরে ছিলেন। তারা রাস্তায় বের হওয়ার পর পুলিশের একটি কন্টিনজেন্ট তাদের পথ রোধ করে একটি ট্রাকে আবু সাঈদের লাশ তুলে নিয়ে চলে যায়। সেখানে বহু শিক্ষার্থী উপস্থিত ছিলেন। তাদের চোখের সামনেই ঘটনা ঘটে। পুলিশ আবু সাঈদের লাশ আবারও হাসপাতালে নিয়ে যায়।

শেফাসহ অন্য শিক্ষার্থীরা জানান, পুলিশের সঙ্গে রুদ্ধদ্বার বৈঠকের পর চিকিৎসকরা জানান, আবু সাঈদের মৃত্যুর কারণ রাবার বুলেট। আবু সাঈদের লাশের ময়নাতদন্তকারী চিকিৎসক জানান, তিনি আবু সাঈদের শরীরে বেশ কিছু প্যালেট পেয়েছেন। সাঈদের মৃত্যু হয় শক ও অভ্যন্তরীণ রক্তক্ষরণের কারণে।

এর মধ্যেই আবু সাঈদের এক বন্ধু তার মা-বাবাকে ফোন করে মৃত্যুর খবর দেন। তার মা মোসাম্মত মোনোয়ারা বেগম জানান—'আবু সাঈদ আন্দোলন করছেন—এ ব্যাপারে কিছুই জানতেন না তিনি। কেউ একজন তাকে ওই ভাইরাল হয়ে যাওয়া ভিডিওটি দেখান।'

তিনি বলেন—'আমার মনে হলো কেউ পাখি বা কোনো পশুর মতো গুলি করে ওকে মেরে ফেলল। আমার বিশ্বাস হচ্ছিল না। বুকে তীব্র ব্যথা হচ্ছিল।'

আবু সাঈদের বাবাও ভিডিওটি দেখেছেন। তিনি বলেন—'ভিডিওটি দেখতে গিয়ে আমার প্রাণ যেন শরীর থেকে বের হয়ে যাচ্ছিল।'

রংপুর হাসপাতাল মর্গ থেকে একটি অ্যাম্বুলেন্সে করে তার লাশ বাড়ি নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করা হয়। তবে পুলিশ জানায়, তার পরিবারকে আগে নিশ্চয়তা দিতে হবে যে, রাতের মধ্যেই লাশের দাফন সম্পন্ন হবে। আবু সাঈদের চাচাতো ভাই ২৮ বছর বয়সি রুহুল আমিন জানান, পুলিশ লাশ লুকাতে চাইছিল। তারপর কোনোমতে লাশ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়। তখন ছিল রাত। মধ্যরাতে একজন স্থানীয় সরকারি কর্মকর্তা এবং আওয়ামী লীগের

কয়েকজন নেতা তাদের বাড়িতে গিয়ে রাতের মধ্যেই লাশ দাফন করার জন্য চাপ দেন। তবে আবু সাঈদের বাবা তাতে রাজি হননি। তারা ধর্মমতে যথাযথ নিয়ম মেনে লাশ দাফন করবেন বলে জানান, যা তাড়াহুড়ো করে সম্ভব নয়।

আবু সাঈদের বাবা বলেন—'আমার ছেলের কোথায় এবং কখন দাফন হবে তার সিদ্ধান্ত আমি নেব।'

আওয়ামী লীগের এক সদস্য নূর মোহাম্মদ মঞ্জু ওই রাতে আবু সাঈদের বাসায় গিয়েছিলেন। তিনি জানান, সান্ত্বনা দেওয়ার জন্যই গিয়েছিলেন তিনি।

স্থানীয় কর্মকর্তা ইকবাল হাসান জানান, জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তাদের নির্দেশে সরকারি প্রতিনিধি হিসেবে সেখানে গিয়েছিলেন তিনি। পরিবারকে চাপ দেওয়ার জন্য নয়। তিনি বলেন—'পরিবারের সিদ্ধান্ত অনুসারেই লাশ দাফন করা হয়।'

বাঁশ দিয়ে আবু সাঈদের কবর ঘিরে রাখা হয়েছে। সামনে লেখা—'শহিদ আবু সাঈদের কবর'।

আবু সাঈদের হত্যাকাণ্ডের খবর ছড়িয়ে পড়লে সারা দেশে বিক্ষোভ বৃদ্ধি পায়। হাজারো ছাত্র রাস্তায় নেমে আসে। আগস্টের গোড়ার দিকে শিক্ষার্থীরা হাসিনার সরকারি বাসভবন অভিমুখে মার্চ করার সিদ্ধান্ত নেয়। ওই সময় সেনাবাহিনী দ্রুত হাসিনাকে দেশ ছেড়ে যাওয়ার পরামর্শ দেয়। কারণ, তাদের পক্ষে হাসিনাকে সুরক্ষা দেওয়া সম্ভব হচ্ছিল না।

এই সপ্তাহগুলোতে আবু সাঈদ পুরো বাংলাদেশের জন্য হিরো হয়ে ওঠেন। তার মৃত্যু দেশকে স্বৈরাচারের হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার পথ সহজ করেছে।

তার বাড়িমুখী সড়কের নাম এখন 'প্রথম জাতীয় শহিদ আবু সাঈদ রোড'।

আবু সাঈদের বাবা ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ দেখেছেন। ১৯৪৭ সালে ভারত-পাকিস্তান ভাগ হওয়ার ভয়াবহ স্মৃতিও তার আছে। ছেলে দেশের জন্য জীবন দেওয়ায় তিনি তাকে নিয়ে গর্বিত।

তবে আবু সাঈদের মা এভাবে ভাবেন না। তিনি মনে করেন, ছেলে যদি কখনও বিক্ষোভে না জড়াত তাহলেই হয়তো ভালো হতো। তিনি বলেন—'আহা! আমার ছেলে যদি আমার সঙ্গেই থাকত!'

বাংলাদেশের লৌহমানবী
শেখ হাসিনার পতন

NIKKEI **Asia**

(*নিক্কেই এশিয়া*-য় ২৪ আগস্ট *দ্য ডাউনফল অব শেখ হাসিনা, বাংলাদেশ'স আয়রন লেডি* শিরোনামে নিবন্ধটি ছাপা হয়। লিখেছেন তরু তকাহাসি।

শেখ হাসিনা বহু বছর ধরে শক্ত হাতে বাংলাদেশ শাসন করেছেন। সহিংস বিক্ষোভের মুখে গত ৫ আগস্ট তিনি ক্ষমতাচ্যুত হন এবং দেশ ছেড়ে পালিয়ে যান। প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনে বিক্ষুব্ধ জনতা ঢুকে পড়ে। সেখানেই জনতার বিজয়কে উদ্‌যাপন করেন তারা। ১৫ বছর ক্ষমতায় থাকার পর এভাবেই পতন হয় বিশ্বের সবচেয়ে বেশি সময় ধরে ক্ষমতায় থাকা নারী শাসকের।

হাসিনার ক্ষমতায় থাকার শেষ ২৪ ঘণ্টা আবার স্মরণ করা যেতে পারে। এ ব্যাপারে প্রতিবেদন প্রকাশ করে বাংলাদেশের দৈনিক প্রথম আলো, ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস ও রয়টার্সসহ আরও বেশ কয়েকটি সংবাদমাধ্যম।

দেশজুড়ে বাড়তে থাকা বিক্ষোভ দমনে ৪ আগস্ট সন্ধ্যা ৬টায় অনির্দিষ্টকালের জন্য কারফিউ জারি করেন হাসিনা। ওই রাতে সেনাপ্রধান জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামান উচ্চপদস্থ সেনা কর্মকর্তাদের নিয়ে অনলাইনে একটি বৈঠক করেন। ওই বৈঠক থেকে বেসামরিক জনগণের ওপর গুলি না চালানোর সিদ্ধান্ত আসে। অর্থাৎ, কারফিউ ভেঙে যারা রাস্তায় নামবেন, তাদের ওপর গুলি চালানো হবে না। এরপর সেনাপ্রধান প্রধানমন্ত্রীকে ফোন করে জানান, তার বাহিনী রাজধানী ঢাকায় লকডাউন বলবৎ করবে না।

৫ আগস্ট সকালেও হাসিনা তার অতি সুরক্ষিত প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনে অবস্থান করছিলেন। বিক্ষোভকারীদের দমনের মূল দায়িত্ব পালন করছিল পুলিশ। ৫ তারিখ সকালে তারাও পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থ হয়। এক জ্যেষ্ঠ সরকারি

কর্মকর্তা হাসিনাকে পদত্যাগের অনুরোধ জানান। তবে তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেন। ফলে জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তারা এরপর হাসিনার বোন শেখ রেহানাকে এ অনুরোধ জানান। তবে তাতেও কাজ হয়নি। পরে হাসিনার ছেলে যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসকারী ব্যবসায়ী ও সরকারের উপদেষ্টা সজীব ওয়াজেদ জয় তার মাকে ফোন করে পদত্যাগে রাজি করান। হাসিনার নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে তাকে দ্রুত একটি সামরিক হেলিকপ্টারে করে সাময়িক অনুমতির ভিত্তিতে ভারতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

হাসিনা জাতির উদ্দেশে একটি ভাষণ রেকর্ড করতে চেয়েছিলেন। তবে তার এই অনুরোধ রক্ষা করা হয়নি। সময় ছিল খুবই কম। নিরাপত্তা বাহিনীর আশঙ্কা ছিল, ৪৫ মিনিটের মধ্যে বিক্ষুব্ধ জনতা হাসিনার বাসভবনে পৌঁছে যাবে। এ সময় শেখ হাসিনা ও রেহানা পুরোনো বিমানবন্দরে একটি সামরিক হেলিকপ্টারে করে প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিনের বাসভবনে যান পদত্যাগের আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করার জন্য। দুপুর আড়াইটার দিকে তারা ভারতের উদ্দেশে দেশ ছাড়েন। এর দুই ঘণ্টা পর জেনারেল জামান টেলিভিশনে দেওয়া জাতির উদ্দেশে এক ভাষণে প্রধানমন্ত্রীর পদত্যাগের কথা ঘোষণা করেন। একই সঙ্গে বিরোধী দলগুলোর সঙ্গে বসে অন্তর্বর্তী সরকার গঠনের কথাও বলেন তিনি।

হাসিনার জন্ম ১৯৪৭ সালে পূর্ব বাংলায়। তার বাবা শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের প্রথম প্রেসিডেন্ট। তিনি ১৯৭১ সালে পাকিস্তানের থেকে বাংলাদেশের স্বাধীনতার লড়াইয়ে নেতৃত্ব দেন। এর চার বছর পর এক সামরিক অভ্যুত্থানে নিহত হন তিনি। একই সঙ্গে হাসিনার মা এবং তার ১০ বছর বয়সি ভাইসহ আরও অনেকে নিহত হন। ওই সময় হাসিনা ও রেহানা জার্মানিতে থাকায় বেঁচে যান। কয়েক বছর ভারতে নির্বাসনে থাকার পর দেশে ফেরেন তারা।

১৯৮১ সালে হাসিনা দেশে ফিরে আওয়ামী লীগের প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এই দলটির নেতৃত্বে ছিলেন তার বাবা। ১৯৯০ সালে দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হলে ১৯৯১ সালে আয়োজিত নির্বাচনে দলকে নেতৃত্ব দেন তারা দুই বোন। তবে সেবার তারা খালেদা জিয়ার নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের (বিএনপি) কাছে পরাজিত হন।

১৯৯৬ সালের নির্বাচনে জয়ী হন হাসিনা। প্রথমবারের মতো দেশের প্রধানমন্ত্রী হন তিনি। তবে এর পরের কয়েক বছর দুই প্রধান রাজনৈতিক দল পর্যায়ক্রমে সরকার গঠন করে। ২০০9 সালে ক্ষমতায় এসে হাসিনা তার একচ্ছত্র ক্ষমতাধারী রাষ্ট্রনায়কে পরিণত হন। বিরোধী দলকে দমন করে তার ক্ষমতা দীর্ঘায়িত করেন।

সরকারি চাকরিতে বিতর্কিত কোটাব্যবস্থার বিরুদ্ধে শুরু হওয়া বিক্ষোভের সূত্র ধরে পতন হয় লৌহমানবী হাসিনার। দীর্ঘদিন ধরে বাংলাদেশ বিশ্বের অন্যতম দরিদ্র রাষ্ট্র। দেশটির সরকারি চাকরিতে নারী, উপজাতীয় ও সুবিধাবঞ্চিত মানুষসহ ১৯৭১ সালের স্বাধীনতাযুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের পরিবার-পরিজনদের জন্য কোটাব্যবস্থা রয়েছে। এর মধ্যে মুক্তিযোদ্ধাদের পরিবারের জন্য রাখা হয় ৩০ শতাংশ কোটা।

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে দেশটি অর্থনৈতিকভাবে বেশ কিছুটা এগিয়ে যায়। এর প্রধান কারণ গার্মেন্টস খাত। তবে তারপরও উচ্চশিক্ষিতদের মধ্যে বহু যুবক বেকারই থেকে যায়। এ কারণে কোটাব্যবস্থার বিরুদ্ধে রাস্তায় নামে শিক্ষার্থীরা। তারা দাবি করে, এ ব্যবস্থা অন্যায্য এবং এর বিলোপ ঘটাতে হবে। মেধার ভিত্তিতে সরকারি চাকরিতে নিয়োগ দিতে হবে।

ছয় বছর আগে প্রায় ৫০ হাজার শিক্ষার্থী কোটাব্যবস্থার সংস্কারের দাবিতে আন্দোলন করে। সে সময় হাসিনা মুক্তিযোদ্ধাদের সব কোটা বাতিল করেন। তবে এ বছর ৫ জুন হাইকোর্ট হাসিনার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়। তারা জানায়, কোটা বাতিলের সিদ্ধান্ত অসাংবিধানিক এবং কোটা বলবৎ থাকবে। কোর্টের এই সিদ্ধান্তের পর আবারও বিক্ষোভ শুরু হয়।

সরকার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপিল করে। তবে তাতে শিক্ষার্থীদের থামানো যায়নি। তাদের দাবি ছিল, রাজনৈতিক চাপের কারণে আদালত এ সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এ সময় হাসিনা অভিযোগ করেন, বিএনপির উসকানির কারণে ছাত্ররা এ অবস্থান নিয়েছে। তিনি আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে বিক্ষোভ দমনের নির্দেশ দেন। পরিস্থিতি আরও খারাপ হয় যখন হাসিনা বিক্ষোভকারীদের রাজাকার পরিবারের লোক বলে সম্বোধন করেন। স্বাধীনতাযুদ্ধে পাকিস্তানের সেনাবাহিনীকে সাহায্যকারীদের ‘রাজাকার’ বলা হয়। বাংলাদেশে এটি গালি হিসেবে বিবেচিত।

এই বিক্ষোভ একসময় চাকরিতে কোটাব্যবস্থা বাতিলের দাবির পরিবর্তে সরকার পতনের আন্দোলনে পরিণত হয়। ২১ জুলাই সুপ্রিম কোর্ট সরকারি চাকরিতে কোটাব্যবস্থা বাতিলের রায় দেয়। তবে ততদিনে অনেক দেরি হয়ে গেছে। নিরাপত্তা বাহিনীর সঙ্গে ছাত্রদের সহিংসতা বৃদ্ধি পেয়েছে। বহু হতাহতের ঘটনাও ঘটে গেছে। ১৬ আগস্ট জাতিসংঘের এক প্রতিবেদনে সাড়ে ছয়শ মানুষের নিহত হওয়ার কথা জানানো হয়।

হাসিনাকে তার নৃশংসতার ভয়াবহ মাসুল দিতে হলো। ৪৩ বছর আগে নির্বাসন থেকে যখন ফিরে আসেন, তখন তাকে স্বাগত জানানো হয়েছিল শেখ মুজিবের মেয়ে হিসেবে। কিন্তু পুনরায় তাকে সেই নির্বাসনেই ফিরে যেতে হলো।

সবচেয়ে বড়ো প্রশ্ন হলো—একসময় যাকে বাংলাদেশের গণতন্ত্রের মশালবাহী হিসেবে বিবেচনা করা হতো, তাকে কেন নির্দয় স্বৈরশাসক হিসেবে বিদায় নিতে হলো?

জাপান এক্সটার্নাল ট্রেড অর্গানাইজেশন'স ইনস্টিটিউট অব ডেভেলপিং ইকোনমিক্স-এর এক্সিকিউটিভ ভাইস প্রেসিডেন্ট মায়ুমি মুরাইয়ামা বলেন—'১৯৯৬ সালে প্রথমবার প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর তাকে আমার কর্তৃত্বপরায়ণ মনে হয়নি।'

২০০৯ সালে ক্ষমতায় ফেরার পর হাসিনার মধ্যে স্বৈরাচারী প্রবণতা স্পষ্ট হতে থাকে। এর আগে দুই বছর তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে ছিল বাংলাদেশ। হাসিনা সংবিধানে সংশোধনী নিয়ে আসেন। বাতিল করে দেন তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা। মজার ব্যাপার হচ্ছে, বিরোধী দলে থাকার সময় এই ব্যবস্থা তিনিই দাবি করেছিলেন। এই ব্যবস্থার মাধ্যমে অবাধ, মুক্ত নির্বাচনের মাধ্যমে শান্তিপূর্ণ উপায়ে সরকারের পরিবর্তন নিশ্চিত করা সম্ভব হয়। সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে হাসিনা তার ক্ষমতায় থাকার পথ মসৃণ করেন।

তিনি দুর্নীতির অভিযোগে খালেদা জিয়ার বিচারের ব্যবস্থা করেন। তবে শুধু বিরোধী দলকে দুর্বল করে দেওয়ার মধ্যেই তার কর্তৃত্বপরায়ণ মনোভাব সীমিত ছিল না। তিনি তার বাবাকে অসম্মানকারীদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করেন। দেশের মধ্যে এমন একটি পরিবেশ সৃষ্টি করেন, যেখানে সরকার-বিরোধিতাকে সহ্য করা হয় না।

হাসিনার এসব স্বৈরাচারী ব্যবস্থার সবচেয়ে কঠোর প্রভাব পড়ে বিশ্ববিদ্যালয় ও গণমাধ্যমে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে আওয়ামী লীগের ছাত্রসংগঠনগুলো ছাড়া আর কারও দেখা মেলেনি। সরকারের সমালোচনাকারীদের তীব্র হেনস্থার শিকার হতে হতো। যেমন সমালোচনাকারী ছাত্ররা হলে সিট পেতেন না। এসব জমে থাকা ক্ষোভেরই প্রকাশ দেখা যায় কোটা সংস্কার আন্দোলনে। শেখ হাসিনার শাসনের সবচেয়ে সুবিধাবাদী অংশ ছিল তার দল আওয়ামীলীগের ছাত্রসংগঠন ছাত্রলীগ।

হাসিনার সঙ্গে মতের অমিল হলে টিকতে পারতেন না কেউ। তার অর্থনৈতিক উপদেষ্টা ছিলেন মশিউর রহমান। তিনি শেখ মুজিবেরও সচিব ছিলেন। গওহর রিজভীর কথাও বলা যায়। তিনি পররাষ্ট্রনীতি-বিষয়ক উপদেষ্টা ছিলেন। ভারতের দৈনিক দ্য হিন্দু জানায়, হাসিনা তার সেরা উপদেষ্টাদেরই সরিয়ে দিয়েছিলেন মতের অমিলকে কেন্দ্র করে। শেষ পর্যন্ত শুধু ছোটো বোন রেহানার ওপরই ভরসা করতেন হাসিনা।

মুরায়ামা বলেন—'প্রধানমন্ত্রীর আশপাশ ছিল তোষামোদকারীদের দিয়ে ঠাসা। তিনি সম্ভবত শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভের কারণ ও আকাঙ্ক্ষা বুঝতে পারেননি।'

বাংলাদেশে প্রেসিডেন্টের রাজনৈতিক ক্ষমতা খুব বেশি না। তবে প্রেসিডেন্ট শাহাবুদ্দিন ও জেনারেল জামান হাসিনা-পরবর্তী পরিস্থিতি খুব দ্রুতই সামলে নেন। বিরোধী দল, সুশীল সমাজ ও ছাত্রদের সঙ্গে আলোচনার পর প্রেসিডেন্ট আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন সংসদ ভেঙে দেন। গ্রামীণ ব্যাংকের প্রতিষ্ঠাতা ও নোবেলজয়ী ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বে একটি অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠিত হয়।

শিক্ষাবিদ, সাবেক কূটনীতিক, কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সাবেক গভর্নর, অবসরপ্রাপ্ত সেনা কর্মকর্তা এবং শিক্ষার্থীদের প্রতিনিধি নিয়ে ১৬ সদস্যের অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠন করা হয়। এই সরকার দেশটি স্থিতিশীল করে একটি নির্বাচনের আয়োজন করবেন।

বাংলাদেশের রাজনৈতিক মানচিত্র বহুদিন ধরেই বিভক্ত। প্রায় ৩০ শতাংশ করে মানুষের সমর্থন আওয়ামী লীগ বা বিএনপির পক্ষে। বাকি ৪০ শতাংশ মানুষ ছোটো ছোটো দলগুলোকে সমর্থন করে। সম্ভবত বিএনপি আবারও ক্ষমতায় আসার চেষ্টা করবে। দলটির নেতা খালেদা জিয়া কার্যত গৃহবন্দি দশা

থেকে মুক্তি পেয়েছেন সম্প্রতি। বিএনপি ক্ষমতায় এলে তারা আওয়ামী লীগের ব্যাপারে প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে উঠতে পারে। ফলে দেশের রাজনীতিতে ইটের বদলে পাটকেলের যে চর্চা, তা আরও দীর্ঘায়িত হবে বলেই মনে করা হচ্ছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক নিলুফার ইয়াসমিন বলেন—'এতদিন পর্যন্ত যে দ্বিদলীয় ব্যবস্থা চলে এসেছে, বাংলাদেশের মানুষ আর তা দেখতে চায় না। তবে তারপরও জননন্দিত কোনো তৃতীয় দল বা সত্যিকারের বিকল্প তাদের এত স্বল্প সময়ে পাওয়াও সহজ নয়।' তিনি বলেন—'বাংলাদেশে দ্বিতীয়বারের মতো স্বাধীনতা লাভ করেছে।'

প্রশ্ন হচ্ছে, সত্যিকারের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র, যা সেনাবাহিনী বা স্বৈরাচারীর প্রভাব থেকে মুক্ত এবং হাসিনার কর্তৃত্বপরায়ণ শাসন থেকে শিক্ষাগ্রহণকারী সরকার কি গঠন করা সম্ভব হবে?

শুধু বাংলাদেশের সবচেয়ে বড়ো দাতারাষ্ট্র জাপানই নয়; যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপসহ এই গোলার্ধের দক্ষিণে অবস্থানকারী কর্তৃত্বপরায়ণ ও গণতান্ত্রিক বহু দেশই বিশ্বের অষ্টম ঘনবসতিপূর্ণ দেশটিতে কী ঘটতে চলেছে, তা দেখতে তার দিকে আগ্রহ নিয়ে তাকিয়ে আছে।

বাংলাদেশের বিক্ষোভের নেপথ্যে গভীর হতাশা

Outlook

(*আউটলুক*-এ ২২ আগস্ট, ২০২৪ তারিখে *বাহাইন্ড বাংলাদেশ প্রটেস্ট, দ্য ওয়েট অব ডিপসিটেড ফ্রাস্ট্রেশনস* শিরোনামে এই নিবন্ধ প্রকাশিত হয়। লিখেছেন রবিউল আলম)

ঢাকার আকাশে নেমে আসছে সন্ধ্যা। এর ওপর পরিবর্তন যেন ভার হয়ে চেপে বসেছে। ঠিক ঝড়ের আগ মুহূর্তের মতোই থমথমে, বিষণ্ন চারপাশ। শেখ হাসিনার ১৫ বছরের শাসনের অবসানের ঠিক আগের বিকেল ছিল এটি। হাসিনা এমন একটি সরকার পরিচালনা করতেন, যেখানে দমন-পীড়নই ছিল দেশ চালানোর মূল অস্ত্র। ওই বিকেলে বাতাস ভারী হয়ে উঠেছিল উত্তেজনায়। মিরপুর ১০ গোলচত্বরে হাজরো মানুষের স্লোগানে মুখরিত হয়ে উঠছে। একটিই দাবি—মুক্তি।

এদের মধ্যেই দাঁড়িয়ে ছিলেন ইকরামুল হক সাজিদ। ঢাকার সরকারি জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে হিসাববিজ্ঞানে পড়েন তিনি। দৃঢ় প্রত্যয়ে তার চোখ-মুখ কঠোর হয়ে আছে। স্লোগানের সঙ্গেই ওঠানামা করছে তার হৃৎস্পন্দন।

অদ্ভুত এক পরিবেশ, যেখানে আশা আছে, আশঙ্কাও আছে। মিছিল এগোচ্ছে, আওয়াজও তীব্র থেকে তীব্রতর হচ্ছে। চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছে সরকারকে। তখনই এসব আওয়াজকে ভেদ করে শোনা গেল বুলেটের শব্দ। গতি মন্থর হলো মিছিলের। একটি গুলি এসে বিঁধল সাজিদের গায়ে। মাথার পেছনে গুলি লেগে ব্রেইন ভেদ করে চোখ দিয়ে বের হয়ে গেল। মুহূর্তের মধ্যেই বিক্ষোভের সব শক্তি আতঙ্কে পরিণত হলো। মাটিতে লুটিয়ে পড়ল সাজিদ। ধূলার সঙ্গে মিশে যেতে শুরু করল তার রক্ত। মুহূর্তের ভগ্নাংশ সময়ের মধ্যেই জ্ঞানশূন্য হলো শরীর। ভয়ের শীতল স্রোত বয়ে গেল বাকি বিক্ষোভকারীদের মধ্যে।

এর পরের সব চিত্রই ম্লান। চরম নৈরাজ্য আর ছুটোছুটির মধ্যেই সাজিদের বন্ধুরা ওর হালকা শরীরটাকে উঠিয়ে হাসপাতালের দিকে ছুটল। সাজিদের রক্তে ভেজা সবার হাত। নীরব, ব্যাকুল প্রার্থনা—ও যেন সেরে ওঠে।

হাসপাতালের ইমার্জেন্সি রুমের ছুটাছুটি, উদ্‌বেগ আর চিকিৎসকদের হতাশ চেহারা। ওই আঘাত প্রাণঘাতী ছিল। চিকিৎসকদের কিছু করার ছিল না। একটি সুতোয় ঝুলছিল সাজিদের প্রাণ।

এদিকে দেশজুড়ে বাড়ছিল বিক্ষোভ। ক্রমবর্ধমান চাপ হাসিনাকে পদত্যাগে বাধ্য করে। এর পরদিনই তিনি দেশ ছেড়ে পালান। শেষ হয় তার অধ্যায়। তবে এ খবর সাজিদের কানে সম্ভবত পৌঁছেনি। কারণ, গুলিবিদ্ধ হওয়ার পরের ১০ দিনেও জ্ঞান ফেরেনি তার। মস্তিষ্ক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। তার মৃত্যু হয় ১০ দিন পর, বুধবারে। যা পরিবারের জন্য ছিল চরম বিপর্যয়কর। তারা শুধু তাদের ভালোবাসার মানুষকেই হারায়নি। বরং ওই পরিবারের একমাত্র আশা আর সাহস ছিল সাজিদ।

বাংলাদেশের ষষ্ঠ বৃহত্তম শহর নারায়ণগঞ্জ। সেখানকার বিক্ষোভে মৃত্যু হয় ২৫ বছর বয়সি আবুল হাসান সুজনের। সুজন প্রাইভেট সেক্টরে চাকরি করতেন। বিপদ আছে জেনেও বিক্ষোভে যোগ দেন তিনি। ৫ আগস্ট ক্ষমতাসীন দলের কর্মীদের গুলিতে আহত হন তিনি। হাসপাতালে যখন তার চিকিৎসা চলছিল, তখন পদত্যাগ করে দেশ ছেড়ে পালান শেখ হাসিনা। সুজনকে এ খবরটি দেওয়া হয়। এ খবর তার মুখে এক চিলতে হাসি ফুটিয়ে তোলে। তিনি ফিসফিস করে বলেন—'আলহামদুলিল্লাহ।' এর পরদিন তিনি মারা যান; এক পরিবর্তিত পৃথিবী আর অতিসংক্ষিপ্ত একটি জীবনের স্মৃতি রেখে।

সাজিদ আর সুজনের গল্প একটি জাতির বৃহত্তর সংগ্রামের আয়না। ওই কালো দিনগুলোর পর ঢাকার চেহারায় বেশ পরিবর্তন এসেছে। যে সড়কগুলো একসময় বিক্ষোভকারীদের স্লোগান আর আহতদের কান্না-চিৎকারে ভারী হয়ে থাকত, এখন সেগুলো শান্ত হয়ে গেছে। শহরটি শ্বাস নিচ্ছে কিছুটা অন্যভাবে—কিছুটা স্বস্তিতে, আশায় আর গভীর দুঃখবোধে। এই আন্দোলনে যারা মারা গেছেন, তাদের স্মৃতি এখনও উজ্জ্বল, যা প্রতি মুহূর্তে পরিবর্তনের মূল্য কতটা দিতে হয়েছে, তা স্মরণ করিয়ে দেয়। নতুন এক সময়ে প্রবেশ করেছে বাংলাদেশ। তবে অতীতের ক্ষতগুলো জাতির বিবেকের কাছে এখনও জাগরূক।

গত দেড় মাসে ঢাকা ব্যস্ত মেট্রোপলিটন থেকে যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হয়। যেখানে স্বাধীনতা আর মুক্তির জন্য লড়াই ভয়াবহ দৃশ্য রচনা করে দিয়ে গেছে।

শহরের রাস্তাগুলো একসময় প্রাত্যহিক জীবনের ছন্দে গতিশীল ছিল। তারপরই সড়কগুলো স্বাদ পায় প্রতিরোধের অবিস্মরণীয় পদচারণা, রক্তক্ষরণ আর বিজয়ের সম্মিলিত উচ্ছ্বাসের।

এই বিক্ষোভ শুরু হয়েছিল ২০২৪ সালের জুন মাসে। তুলনামূলক ছোট্ট একটি ইস্যুকেন্দ্রিক বিতর্ক দ্রুতই দেশজুড়ে গণ-অভ্যুত্থানে পরিণত হয়, যা শেখ হাসিনা সরকারের ভিত নাড়িয়ে দেয়। প্রথমদিকের পরিবেশ ভয় আর আশার মিশ্র অনুভূতিতে টানটান উত্তেজনায় ভরপুর ছিল। সে সময় সরকারি চাকরিতে ৫৬ শতাংশ কোটা নিয়ে সুপ্রিমকোর্টের রায় কী হবে, তা নিয়ে উদ্‌বিগ্ন শিক্ষার্থীরা জড়ো হতো বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসগুলোতে। এর আগে ২০১৮ সালে সরকারি চাকরিতে কোটাপ্রথা বাতিল করেছিল সরকার। এ বছর জুন মাসে সরকারের সে সিদ্ধান্ত বাতিল করে দেয় হাইকোর্ট, যা শিক্ষার্থীদের মধ্যে গভীর হতাশার জন্ম দেয়।

প্রথমদিকের ওই দিনগুলোতে শিক্ষার্থীরা সতর্কভাবে আশাবাদ ধরে রেখেছিল। রাতে তারা মোমবাতি জ্বালত। মোমের নরম আলো গিয়ে পড়ত বিক্ষোভকারীদের দৃঢ় প্রত্যয় মুখগুলোর ওপর। বাতাসে গুঞ্জরিত হতো মৃদুস্বরের প্রার্থনা। এর মধ্যে তারা শান্তভাবে প্রতিরোধের স্লোগানও দিত। প্রতিরোধ আর শান্তির সহাবস্থান ছিল তখন। তবে এই ভঙ্গুর আশাবাদ খুব দ্রুতই বাস্তবতার ধাক্কা খেয়ে টুকরো হয়ে ছিটিয়ে যায়।

১৫ জুলাই সরকারপন্থি বাংলাদেশ ছাত্রলীগের সদস্যরা রড, লাঠি, রিভলবার নিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ ছাত্রদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। বাংলাদেশের প্রথম প্রেসিডেন্ট শেখ মুজিবুর রহমান এই সংগঠনটি গড়ে তোলেন। শান্তিপূর্ণ আন্দোলনে তীব্র ক্ষোভ ও নৈরাজ্য দেখা দেয়। মুহূর্তের মধ্যে সারা দেশে বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে। সড়কগুলো যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হয়। এক সময়ের শান্তিপূর্ণ সমাবেশ কাঁদানে গ্যাসের গন্ধে ভারী হয়ে ওঠে। কানে আসতে থাকে গুলির শব্দ, পুলিশের লাঠিপেটায় পালাতে থাকা আতঙ্কিত ছেলেমেয়েদের চিৎকার।

পরের দিন ১৬ জুলাই আন্দোলনকারীদের জন্য সবচেয়ে দুঃখের দিন। রংপুরে বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের ওপর এ দিন কাঁদানে গ্যাস ছুড়ে পুলিশ। লাঠিপেটা করার পাশাপাশি তাদের ওপর রাবার বুলেটও ছোড়া হয়।

এ সময় বিক্ষোভের এক সমন্বয়ক আবু সাঈদ দুহাত প্রসারিত করে পুলিশের সামনে দাঁড়িয়ে যান। তার এই সাহসিকতার ভয়াবহ জবাব আসে পুলিশের পক্ষ থেকে। মাত্র ১৫ মিটার দূর থেকে সরাসরি গুলি ছুড়ে হত্যা করা হয় তাকে। দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ে তার এই হত্যাকাণ্ডের ভিডিও। একটি পুলিশি রাষ্ট্রের প্রতীক হয়ে হঠে এই ভিডিও। ক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে সর্বত্র।

১৮ জুলাইয়ের মধ্যে নিহতের সংখ্যা গিয়ে দাঁড়ায় ৪৮-এ। সহিংসতা কমার কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছিল না। সরকারের সংলাপের প্রস্তাব শিক্ষার্থীরা প্রত্যাখ্যান করে। মৃতের সংখ্যা বেড়েই চলছিল। এমন পরিস্থিতিতে মধ্যস্থতার আলোচনা অর্থহীন হয়ে যায়। ১৯ জুলাই পরিস্থিতি আরও খারাপ হয়। একদিনে নিহত হয় ৮৬ জন। যে রাস্তায় আশার স্লোগান দেওয়া হচ্ছিল, সেই পথই ভিজে ওঠে রক্তে। ক্ষোভ আর বেদনায় ভারী হয়ে ওঠে বাতাস।

২১ জুলাই কোটার প্রায় পুরোটাই তুলে দেয় সুপ্রিম কোর্ট। তবে তাতে ক্ষোভ কমেনি। ছোটো ইস্যু নিয়ে শুরু হওয়া আন্দোলন এ পর্যায়ে আরও বহু বিষয়ে ছড়িয়ে যায়। উঠে আসে সরকারের দুর্নীতির কথা, আন্দোলন দমনে সরকারের কঠোর হওয়ার বিষয়টি। ঢাকা পড়ে যায় শেখ হাসিনার আমলে হওয়া অবকাঠামো আর অর্থনৈতিক উন্নয়নের সব অর্জন, যা দারিদ্র্যের কবল থেকে হাজারো মানুষকে বের করে এনেছিল। তার জায়গায় আসে ওই আমলের দুর্নীতি আর দলীয় লোকদের স্বেচ্ছাচারিতার কাহিনি। এই সীমাহীন দুর্নীতিই মানুষকে সরকারবিরোধী বিক্ষোভ চালিয়ে যেতে উৎসাহ জুগিয়ে যায়।

পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে শেখ হাসিনা দেশজুড়ে কারফিউ জারি করেন, কেটে দেওয়া হয় ইন্টারনেটের সংযোগ। বিক্ষোভকারীদের তিনি 'সন্ত্রাসী' হিসেবে চিহ্নিত করেন। তবে এই পদক্ষেপগুলো গণ-অসন্তোষ ও সহিংসতা দমনে কোনো ভূমিকাই রাখতে পারেনি। ১৬ জুলাই থেকে ৫ আগস্টের মধ্যে শেখ হাসিনা পদত্যাগ করে পালিয়ে যেতে বাধ্য হন। হারিয়ে যায় ৪৩৯টি প্রাণ।

শেখ হাসিনার দেশ ছেড়ে পালানোর খবর ছড়িয়ে পড়লে পালটে যায় পুরো বাংলাদেশের চেহারা। ঢাকা তখন উত্তেজনা আর আতঙ্কের নগরী নয়; উৎসবের শহর। স্লোগানের সড়কগুলোতে তখন বিজয়ের উৎসব। মানুষ নেচে-গেয়ে, পরস্পরকে আলিঙ্গন করে জয় উদ্‌যাপন করছে। নিপীড়নের যে ভার চেপে বসেছিল পুরো দেশের ওপর, তা সরে গেছে। আশা আর নতুন

করে বাঁচার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। আন্দোলন শুধু একটি সরকার পরিবর্তনের লড়াই ছিল না, ছিল মর্যাদা আর মানবতা প্রতিষ্ঠার যুদ্ধ। যদিও এই আনন্দের মধ্যেও ছিল তীব্র দুঃখের স্রোত। যারা এই আন্দোলনে প্রাণ দিয়েছেন, তাদের জন্য পুরো দেশ বেদনাবোধে ভারাক্রান্ত।

এর পরের দিনগুলোতে ঢাকায় পুনর্গঠন প্রক্রিয়া শুরু হয়। পুনর্গঠন শুরু হয় শারীরিক ও মানসিকভাবে। তখন শহরজুড়ে বিক্ষোভের ক্ষতচিহ্ন। দাঁড়িয়ে থাকা ভবনগুলোর শরীরে আর মানুষের মনে। তবে একই সঙ্গে রয়েছে উন্নত ভবিষ্যৎ বিনির্মাণে নতুন স্বপ্ন, নতুন শক্তি। পুরো জাতির সামনেই এখন পুনর্গঠনের নতুন চ্যালেঞ্জ। বহু বছরের নিপীড়ন আর সংঘাতের পর পালটে দিতে হবে রাজনৈতিক কাঠামো আর সামাজিক বুনন।

হাসিনার পালিয়ে যাওয়া বাংলাদেশের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। হাসিনার পতনের পর অন্তর্বর্তী সরকারে দায়িত্ব নেন নোবেলবিজয়ী অর্থনীতিবিদ ড. মুহাম্মদ ইউনূস। আর পরিবর্তনের আশাতেই চলছে উৎসব। ইউনূস এমন একটি দেশ পেয়েছেন, যেখানে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান দুর্নীতি আর স্বৈরাচারী শাসনে ন্যুজ। তার নেতৃত্বে অতিপ্রয়োজনীয় সংস্কার সম্পন্ন হবে, স্বচ্ছতার সঙ্গে সুশাসন থাকবে এবং ব্যক্তিস্বাধীনতার সুরক্ষা দেওয়া হবে বলে বলেই আশা করছে সবাই।

সাম্প্রতিক সহিংসতা অর্থনৈতিকভাবে দেশকে পিছিয়ে দিয়েছে অনেকখানি। সেখানেও সংস্কারের প্রয়োজন। দারিদ্র্য বিমোচনে ইউনূসের অভিজ্ঞতা এ ক্ষেত্রে দেশকে পথ দেখাতে পারে। সামাজিকভাবে ড. ইউনূস সরকারকে অবশ্যই বিভাজন দূর করতে হবে এবং বিভিন্ন স্তরের মানুষের মধ্যে ঐক্য স্থাপন করতে হবে।

তবে আশাবাদী হওয়ার ক্ষেত্রেও সতর্ক হতে হবে এবং তারও বেশ কিছু কারণ আছে। যাদের আন্দোলনের কারণে হাসিনা সরকারের পতন ঘটেছে, তারা বাংলাদেশের নতুন প্রজন্ম—তরুণ, শিক্ষিত ও বৈশ্বিক পরিস্থিতির সঙ্গে সংযুক্ত। তারা নেতাদের কাছ থেকে অনেক বেশি আশা করেন। অচলাবস্থা তাদের পছন্দ নয়। এই প্রজন্ম অর্থবহ পরিবর্তন আনতে সক্ষম। অসাম্য, দুর্নীতি, অবিচারের সুগভীর শিকড় উপড়ে ফেলে প্রয়োজনীয় সংস্কার আনতে তারা পারবেন।

DIU
WE ARE FREE

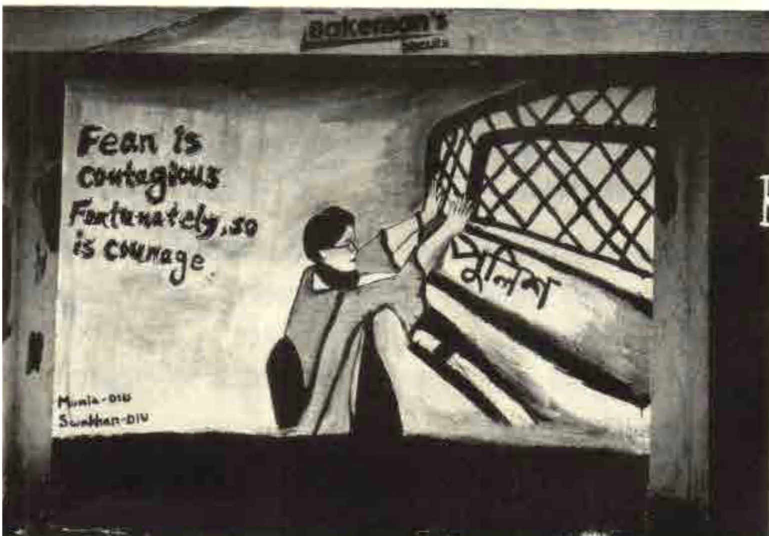
Fear is contagious
Fortunately, so is courage.
পুলিশ

বিস্ফোরণে উন্মুখ ছিল বাংলাদেশ, আমি ছিলাম ছাত্রদের সঙ্গে

The Washington Post

(*ওয়াশিংটন পোস্ট*-এ শহীদুল আলমের লেখা এই নিবন্ধ প্রকাশিত হয় ৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৪-এ। শিরোনাম ছিল *বাংলাদেশ ওয়াস রেডি টু এক্সপ্লোড. আই ওয়াস দেওয়ার উইথ দ্য স্টুডেন্টস*)

শাহবাগকে বাংলাদেশের তাহরির স্কয়ারের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। আমরা কারফিউ ভেঙে শাহবাগের উদ্দেশে রওনা হই। অশ্রুসজল চোখে আমরা আহতদের বিদায় দিলাম। জানি না, আর কখনও দেখা হবে কি না! ছাত্র-শিক্ষক-সাংবাদিক মিলে আমাদের দলের সদস্য প্রায় ২০ জন। আমাদের লক্ষ্য করে পুলিশ গুলি ছুড়তে শুরু করে। তিনজনের শরীর বুলেটবিদ্ধ হয়। তাদের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পর আমি আর আমার সঙ্গী এক রিকশাওয়ালার দেখা পেলাম। বেশ সাহসী। ওই পরিস্থিতির মধ্যেই তিনি আমাদের শাহবাগে নিয়ে যেতে রাজি হলেন। ঢাকার নানা গলিপথ ঘুরে আমরা শাহবাগে পৌঁছালাম। এর মধ্যেই সেখানে পৌঁছে গেছে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পদত্যাগের খবর। অস্ত্র হাতে সেনা আর তাদের সাঁজোয়া যানের চারপাশে উল্লাস করছে তরুণরা। বিজয়োল্লাস! আমি ৫ আগস্টের কথা বলছি। এর মাত্র কয়েক দিন আগেই সেনারা আমাদের লক্ষ্য করে গুলি ছুড়েছে।

দীর্ঘদিন ধরেই বাংলাদেশের রূপ দুটি। প্রথমটি ধনী হয়ে ওঠতে থাকা বাংলাদেশ, যার মোট দেশজ উৎপাদন বৃদ্ধির হার বিশ্বের দ্রুত বর্ধনশীল জিডিপিসমৃদ্ধ দেশগুলোর মধ্যে অন্যতম। বিশ্বের সবচেয়ে দীর্ঘদিন ক্ষমতায় থাকা নারী শাসক শেখ হাসিনা এই বাংলাদেশকে নেতৃত্ব দিতেন। আরেকটি বাংলাদেশ হচ্ছে, দীর্ঘদিন থেকে ভোগান্তির মধ্যে থাকা এক বিপুলসংখ্যক জনগোষ্ঠীর দেশ। তারা সেই নিষ্ঠুর স্বৈরশাসকের অধীনে বাস করেন—যিনি

নাগরিকদের জেলে পাঠান, গুম করেন, খুন করেন সেই ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য। তার শাসনামলে বাংলাদেশ বিপজ্জনকভাবে দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়ে। আপনি হয় তার দল আওয়ামী লীগের সঙ্গে আছেন অথবা আপনাকে রাজাকার ঘোষণা করা হবে। 'রাজাকার' অর্থ হচ্ছে শত্রুর সহযোগী, দেশের শত্রু।

বাংলাদেশের উন্নয়ন ক্ষমতাসীন দলের সদস্য এবং তাদের ব্যবসায়ী সম্প্রদায়কে নিয়ে একটি অভিজাত শ্রেণির জন্ম দেয়। এর চারপাশে ঘুরতে থাকে বুদ্ধিজীবী, সাংস্কৃতিক অঙ্গনের কিছু মানুষ আর চাকরিজীবীরা। সুবিধা নিয়ে সরকারকে সমর্থন জুগিয়ে চলেন এরা। নরেন্দ্র মোদির ভারত এই সরকার আর তাদের দুর্নীতির সবচেয়ে বড়ো গ্যারান্টার ছিল। ২০১০ সাল থেকে ২০১৯ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশ বিশ্বের অতি ধনীদের তালিকায় নেতৃত্ব দেয়। বিশ্বের দ্বিতীয় তৈরি পোশাক প্রস্তুতকারী আমাদের দেশ সুউচ্চ অট্টালিকা আর ঝলমলে শপিং সেন্টারে ভরে ওঠে।

আরেকটি বাংলাদেশ গড়ে উঠেছে ভাগ্যবঞ্চিত শ্রমজীবী শ্রেণিকে নিয়ে—গার্মেন্টস কর্মী, প্রবাসী শ্রমিক, কম পয়সায় কাজ করা আরও কোটি কোটি মানুষ। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই অমানবিক পরিবেশে কাজ করে তারা। আর তাদের উপার্জিত পয়সাতেই ভরে ওঠে ধনীদের পকেট। এসব শ্রমজীবী মানুষের অনেকেরই বাস বস্তিগুলোতে, যেখানকার পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা খুবই শোচনীয়। বেশিরভাগই মাসিক ভাড়ায় বাসা নেয়। বেতনের বেশিরভাগ অর্থই চলে যায় ভাড়ায়। এদের বেতন ১১৩ ডলারের বেশি না, যা একটি পরিবার চালানোর জন্য একেবারেই অপ্রতুল। গার্মেন্টস শ্রমিকদের ১০-১৫টি পরিবার একসঙ্গে হয়ে পচে যাওয়া সবজি একটু কম দামে কেনার চেষ্টা করে।

এই দুই বাংলাদেশের মধ্যে যে পার্থক্য, তা পুরো জাতিকে বিভক্ত করে ফেলেছে।

সরকারি চাকরিতে কোটাব্যবস্থার বিতর্কিত পদ্ধতি গত জুলাইয়ে প্রবল ছাত্র আন্দোলনের জন্ম দেয়। এই আন্দোলন পুরো দেশে ছড়িয়ে পড়ে। এই ব্যবস্থায় মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য একটি বড়ো অংশ বরাদ্দ করা হয়। দেশ স্বাধীন হওয়ার ৫০ বছর পর নেওয়া এ সিদ্ধান্ত সরকারপন্থিদের সুবিধা দিলেও প্রত্যাশিত চাকরি ক্ষেত্রে বৈধ আবেদনকারীদের সংকটে ফেলে দেয়। এই কোটাব্যবস্থার বিরুদ্ধে শিক্ষার্থীরা ২০১৮ সালেও বিক্ষোভ করেছে।

শক্তিপ্রয়োগ করে ওই আন্দোলন দমনে ব্যর্থ হয়ে শেখ হাসিনা কোটাব্যবস্থাই তুলে দেন। এই বছর ৫ জুন সেই আদালত আবার সেই ব্যবস্থা প্রবর্তন করলে ক্ষুব্ধ হয় শিক্ষার্থীরা। তারা শান্তিপূর্ণভাবে রাস্তায় এর প্রতিবাদ জানাতে থাকে। সরকার শক্তহাতে এ আন্দোলন দমনের চেষ্টা করে। এ দফায় প্রশাসন আগ্নেয়াস্ত্রও ব্যবহার করে। এর কয়েক দিনের মধ্যেই নিরাপত্তা বাহিনীর গুলিতে ছয় শিক্ষার্থী নিহত হন।

সরকারি চাকরিতে সুযোগ পাওয়ার এই আন্দোলন খুব দ্রুতই মর্যাদা আর মৌলিক অধিকার আদায়ের আন্দোলনে পরিণত হয়। গত ১৫ বছর ভীতি আর নিপীড়নের শাসন কায়েম করে ক্ষমতায় ছিলেন হাসিনা। তবে গুলির মুখেও মানুষ এবার সরে দাঁড়ায়নি। তারা জানত, এবার আর ফিরে যাওয়ার পথ নেই। ছাত্ররা হাসিনাকে ক্ষমা চাওয়ার দাবি জানায়। এই সাধারণ একটি ক্ষমা চাওয়াই হয়তো তাকে রক্ষা করতে পারত। তীব্র অহংবোধের কারণে তিনি সে পথে হাঁটতে পারেননি। শেষ পর্যন্ত তার অহংকারই তার পতন ডেকে আনে।

তবে জনগণকে এর জন্য কঠিন মূল্য পরিশোধ করতে হয়। সহিংস নিপীড়নে কয়েকশ মানুষ নিহত হয়। ইন্টারনেট ও টেলিফোন সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয়। আহত হয় হাজারো মানুষ। ২৫ বছর বয়সি ইংরেজি সাহিত্যের শিক্ষার্থী আবু সাঈদ গুলিতে ঝাঁঝরা হয়ে মারা যান। তার সেই মৃত্যুর দৃশ্য বাংলাদেশের মানুষের হৃদয়ে গেঁথে থাকবে। ১৬ জুলাই তার গুলিবিদ্ধ হয়ে নিহত হওয়ার দৃশ্য ভাইরাল হয়। শিক্ষার্থীরা শেখ হাসিনার পতনের আন্দোলন শুরু করে।

সাঈদের মা-বাবা শ্রমজীবী শ্রেণির মানুষ। এ তরুণ দেশের একটি সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ছিলেন। পরিবারকে সহায়তা করার জন্য তিনি টিউটর হিসেবেও কাজ করতেন। আবু সাঈদের মতো অনেকের জন্য সরকারি চাকরি নিজেদের অবস্থা পরিবর্তনের প্রধানতম হাতিয়ার। ছাত্র আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছেন আবু সাঈদের মতো ছাত্ররাই। অবস্থাপন্ন পরিবারের সন্তানরা বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখাপড়া করে। তাদের সামনে আরও পথ রয়েছে। তারা দেশের বাইরে যেতে পারে, কর্পোরেট প্রতিষ্ঠানে চাকরি করতে পারে, পারিবারিক ব্যবসায় যোগ দিতে পারে বা উদ্যোক্তা হিসেবেও কাজ করতে পারে। তারপরও এই সুবিধাপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীরাও এবারের আন্দোলনে যোগ দেয়। কারণ, বাংলাদেশ আর পারছিল না নিপীড়নের ভার নিতে!

সাংবাদিক হিসেবে আমার পুরো পেশাজীবনই কেটেছে পথে। ছাত্র আন্দোলন নিয়ে সংবাদ করছি ২০১৮ সাল থেকেই। রাজপথের আন্দোলনের ধরন আমি জানি। ২০১৮ সালে 'চলমান আন্দোলনে উসকানি দেওয়ার' অভিযোগে অভিযুক্ত হয়ে আমি জেলে যাই। তখন সেখানেও বেশ কয়েকজন ছাত্রের সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছে। এবারের গ্রীষ্মে আন্দোলন চলার সময় তাদের বেশ কয়েকজনকে আমি আশ্রয় দিই। অনেকের সঙ্গেই আমার দেখা হয়। এদের অনেকেই নিরাপত্তা বাহিনীর নির্যাতনের শিকার হয়েছে। হাসপাতালে চিকিৎসা নিচ্ছে। আমি তাদের মেন্টরের ভূমিকা পালন করেছি।

হ্যাঁ, আমি চেয়েছি, এ সরকারের পতন হোক। তবে তা এত দ্রুত ঘটতে পারে তা আমার ধারণার বাইরে ছিল। প্রধানমন্ত্রী পালিয়ে যাওয়ার পর শিক্ষার্থীরা রাস্তায় পুলিশের দায়িত্ব গ্রহণ করে। কয়েক দিন আগে এই পুলিশের কাছেই বেদম পিটুনি খেয়েছে তারা। অন্তর্বর্তী সরকার গঠন প্রক্রিয়াও হয় তাদের সিদ্ধান্ত অনুসারে। নোবেলজয়ী ড. মুহাম্মদ ইউনূসকে তারা অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের দায়িত্ব নেওয়ার জন্য আহ্বান জানান। তিনি সেই ডাকে সাড়া দেন। পর্দার আড়ালে সেনাবাহিনীর সঙ্গে আলোচনার পর দুজন ছাত্রও এই সরকারে যোগ দেন। কোনো বিভ্রান্তি ছড়ানোর পথ বন্ধ করতে নতুন সরকারের ওপর নজর রাখতে এই শিক্ষার্থীরা একটি নজরদারি কমিটিও গঠন করে।

বাংলাদেশের নতুন সরকারের বয়স এক মাসেরও কম। সম্মানিত নাগরিকরা কোনো ধরনের প্রস্তুতি ছাড়াই এ সরকার গঠন করেন। অচেনা এক সমুদ্রে নেমে পড়েছেন তারা। এদের প্রায় কারোরই রাজনৈতিক বা প্রশাসনিক কোনো অভিজ্ঞতা নেই। সমস্যার পাহাড় জমে আছে তাদের সামনে। অভিজ্ঞ মন্ত্রিসভার পক্ষেও বাংলাদেশের সমস্যার সমাধান করা কঠিন। বর্ষার বিপ্লবের মতোই সবাইকে তারুণ্যের দেশে স্বাগত জানাচ্ছি!

আমরা প্রাত্যহিক জীবনযাপন করছি। পালাতে থাকা প্রত্যেক মন্ত্রী, এমপি ও উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের গ্রেফতারকে উদ্‌যাপন করছি আমরা। যে মৌলিক অধিকার তাদের প্রাপ্য ছিল, প্রক্রিয়ার কারণে তা হয়তো তাদের দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। তার জন্য আমরা ক্ষমাপ্রার্থী। আমরা সাবেক প্রশাসনের অপরাধের পুনরাবৃত্তি ঘটাচ্ছি হয়তো। তবে এই ফেলে যাওয়া সংস্কৃতি থেকে আমরা বের হয়ে আসব।

আমরা দেখছি। আমরা অপেক্ষা করছি। আশাবাদী হওয়ার মতো বহু নজির রয়েছে। গত মাসে ভয়াবহ বন্যায় আক্রান্ত হয় এই দেশ। ছাত্রদের তত্ত্বাবধানে ত্রাণ তৎপরতায় যে প্রভূত সাড়া পাওয়া যায়, তা উৎসাহব্যাঞ্জক। অন্তর্বর্তী সরকার গুম সংস্কৃতির অবসানে পদক্ষেপ নিচ্ছে, যা হাসিনা সরকারের প্রধান অপরাধ হিসেবে বিবেচিত হয়।

এখন শুধু সময়ই বলে দিতে পারে, গত গ্রীষ্মে বাংলাদেশের সড়কে যে রক্তপাত ঘটেছে, তা এ দেশে ইতিবাচক কোনো পরিবর্তন আনতে পারবে কি না। বা এটা কি নেহায়েতই একটি মৌসুমি পরিবর্তন? সূর্যের অবস্থান পরিবর্তনের কারণে যেমন বর্ষার মৌসুম বিদায় নেয়।

কি দোষ ছিলো
মো: আলামিন
শুভর-
রিকশার গ্যারেজেইতো
কাজ করতো !
CHINMOY 2 TANIA

ভুয়া মামলার ভয়ে চাঁদা দিত ঢাকার হকাররা :

হাসিনার পতনের পর এখন সবকিছুই খুব ভালো

ThePrint

(*দ্য প্রিন্ট*-এ প্রতিবেদনটি ছাপা হয় ৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখে। শিরোনাম ছিল *ঢাকা স্ট্রিট ভ্যান্ডরস গেভ 'হাফতা' পোস্ট হাসিনার ফল, থিংস আর 'খুব ভালো'*)

'এখন সবকিছুই খুব ভালো'

ঢাকার শেরে বাংলা নগরে আখের রস বিক্রি করেন আকবর। ভ্যানের চারপাশে জমে ওঠা ভিড় সামাল দিতে ব্যস্ত তিনি। এক হাতে টাকা নিয়ে ভাংতি বুঝিয়ে দিচ্ছেন ক্রেতাদের।

এক ক্রেতা দুই গ্লাস আখের রসের অর্ডার দিয়েছেন। তবে দাম দেওয়ার মতো পয়সা তার কাছে নেই। আকবর ওই টাকা নিয়ে মোটেই চিন্তিত নন।

আখের রস বের করতে করতে মুখে হাসি নিয়ে তিনি বলছিলেন—'সমস্যা নেই। ওটুকুতে আমি আটকে যাব না। এখন আমাদের আর চাঁদাবাজদের টাকা দিতে হয় না। এক গ্লাস ফ্রি আমি খাওয়াতেই পারি।' বিনে পয়সায় আখের রস খেয়ে মুখে তৃপ্তির হাসি নিয়ে বিদায় নিলেন সেই ক্রেতা।

বহু বছর ধরে আকবরকে নিয়মিত চাঁদা দিতে হয়। সাবেক ক্ষমতাসীন দল আওয়ামী লীগের সদস্যরা এই চাঁদা ওঠাতেন বলে অভিযোগ। হকার, অটোচালক, রিকশাওয়ালা ও চায়ের দোকানদার সবাইকেই দিনে ১০০-২০০ টাকা চাঁদা দিতে হয়। চাঁদার পরিমাণ নির্ভর করে কোনো এলাকায় তারা ব্যবসা করেন তার ওপর।

সাধারণ পোশাকের এসব চাঁদা গ্রহণকারীকে এলাকা ভাগ করে দেওয়া হয়। বলা হয়, কেউ যদি চাঁদা দিতে না চায় তাদের নাম লিখে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য পুলিশকে দেওয়া হবে। পুলিশ তখন এসব লোকের বিরুদ্ধে ভুয়া মামলা দায়ের করবে। অভিযোগ হবে মাদক ব্যবহারের। এটাই সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত অভিযোগ।

৫ আগস্ট শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পর এসব চাঁদাবাজ উধাও হয়ে গেছে। ফলে হকাররা স্বস্তির শ্বাস ফেলছে। আকবর বলেন—'ওই নির্যাতনের দিন আর নেই। আমরা সবাই খুব খুশি।'

তিনি বলেন—'আমি দেড়শ টাকা করে দিতাম। কখনও কখনও আড়াইশ টাকা করেও নিত, যদি দেখত যে, ভ্যানের আশপাশে ক্রেতা বেশি। আমার ভ্যানে বেচাকেনা হচ্ছে কি না অথবা আমার ব্যবসা চলছে না, বন্ধ; তাতে কিছু আসে যায় না। শান্তিতে ব্যবসা করতে চাইলে এই চাঁদা তাদের দিতেই হতো। দু-এক বার আমি টাকা দিতে চাইনি। তখন তারা হয় হুমকি দিয়েছে অথবা মারধর করেছে। আমরা খুব খুশি হয়েছি যে এখন আর তারা নেই।'

তিনি আরও যোগ করেন—'অনেকেই বলে, চাঁদা দিলে সমস্যা কী? এটা সব জায়গাতেই ঘটে। আপনাদের দেশেও (ভারতে) চাঁদা দিতে হয়। তবে আপনি কখনও চিন্তাই করতে পারবেন না, এটা কত স্বস্তিকর। চাঁদাবাজি সব সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছিল।'

চা বিক্রেতা মোহাম্মদ বিলালও একই কথাই বললেন। তিনি জানান, চাঁদা না দিলে পরদিনই পুলিশ এসে হাজির হতো। তাদের সব মালসামান নিয়ে গিয়ে ভুয়া মামলা দায়ের করত।

তিনি বলেন—'তারা হকারদের থানায় নিয়ে গিয়ে মাদক ব্যবহার, চোরাচালান, মাদক বিক্রি ইত্যাদি ভুয়া মামলা ঠুকে দিত। আমার এক বন্ধুকে পুলিশ জেলে নিয়ে যাওয়ার পর চাঁদাবাজ ও পুলিশকে টাকা দিয়ে সে ছাড়া পেয়েছিল। এখন আমরা চাঁদাবাজ ও হয়রানি থেকে মুক্ত।'

বাংলাদেশ পুলিশের মহাপরিদর্শক মইনুল ইসলাম এ সমস্যা থাকার বিষয়টি স্বীকার করেন। তিনি দ্য প্রিন্টকে বলেন, পুরো ব্যবস্থাকেই ঢেলে সাজাতে হবে। তিনি বলেন—'স্থানীয়রা দুর্নীতি ও চাঁদাবাজি সম্পর্কে আমাদের

জানিয়েছেন। আমাদের সবাইকে জানাতে হবে, পুলিশ আপনাদের বন্ধু। যারা রোজ কোনো না কোনো কারণে পুলিশের সংস্পর্শে আসেন, তাদের বোঝাতে হবে আগের প্রবণতাগুলো এখন আর নেই। পরিবর্তন আসতে সময় লাগবে। এটা একটা প্রক্রিয়া। কাজ শুরু হয়েছে এবং এগোচ্ছে।'

'তারা কাউকে ছাড় দিত না'

অটোরিকশা, ক্যাব ও রিকশাচালকরা জানান, তাদের আয় থেকে ট্রাফিক পুলিশকে ভাগ দিতে হতো। দিনে কয়টি ট্রিপ তারা চালাতে পারত, তার ওপর ভিত্তি করে চাঁদা দিতে হতো তাদের।

অটোরিকশা চালক নান্নু মিঞা জানান, ট্রাফিক পুলিশ ঘুসের জন্য তাদের আটকে দিত। ঘুস না দিলেই তাদের চালান করে দেওয়া হতো। তিনি আরও জানান, প্রতিবার অটোতে যাত্রী তুললেই পুলিশকে 'ফি' দিতে হতো। ১০-২০ টাকা দেওয়ার পর অটো ছেড়ে দিত তারা। তিনি অভিযোগ করেন—'এই সরকার আমাদের শেষ করে দিয়েছে। তারা কাউকে ছাড় দিত না। এত দুর্নীতি চারপাশে। এখন আমরা খুব ভালো আছি।'

রিকশা চালান আবু করিম। একবার মেয়ের ওষুধের পুরো টাকা তার পুলিশকে দিতে হয়েছিল। তিনি অভিযোগ করেন—'একবার পুলিশ আমাকে মারধর করে আমার সব টাকা নিয়ে নেয়। আমার অভিযোগ করার কোনো জায়গা ছিল না। আমার অন্য রিকশাওয়ালা বন্ধুরা আমাকে মুখ বন্ধ রাখার পরামর্শ দেয়।'

তিনি আরও জানান—'আমাদের বড়ো রাস্তায় রিকশা চালানোর অনুমতি নেই। সেখানে গেলেও আমাদের ট্রাফিক পুলিশকে ঘুস দিতে হয়। সবাই এটা জানে। আয়ের একটা অংশ ট্রাফিক পুলিশকে দিয়ে দিই আমরা।'

'এখনই ভালো, নির্বাচনের কোনো প্রয়োজন নেই'

চালক আর হকাররা এখন একাট্টা। তারা নির্বাচন চায় না। তাদের ভয়, বিএনপি ক্ষমতায় এলে আবারও এই চাঁদাবাজির সংস্কৃতি শুরু হবে। আওয়ামী লীগ সরকারের বিদায়ের পর গত মাসে অন্তর্বর্তী সরকার ক্ষমতা গ্রহণ করেছে।

বিলাল **বলেন—'আমরা শুনেছি,** কিছু এলাকায় **বিএনপির** লোকজন চাঁদাবাজি শুরু **করেছে**। বাংলাদেশে **এখন এককভাবে বড়ো দল তারাই**। **কোনো দলই ভালো না**। **এই** অন্তর্বর্তী ব্যবস্থাই **(সরকার)** আমাদের জন্য **ভালো**। অন্তত **কোনো** হেনস্থা ছাড়াই **আমরা এখন আমাদের পুরো আয় বাসায় নিয়ে যেতে পারি**।'

বাংলাদেশের ক্ষমতাচ্যুত নেতা হাসিনাকে সহায়তা : বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে ভারত

The Guardian

(*দ্য গার্ডিয়ান*-এ ৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখে *আ মায়োপিক : ইন্ডিয়াস ব্যাকিং অব আউস্টেড বাংলাদেশ লিডার শেখ হাসিনা লিভস ইট ইন অ্যা বাইন্ড* শিরোনামে এ নিবন্ধটি ছাপা হয়। লিখেছেন হান্না ইলিস পিটারসন।)

এ মাসের শুরুর দিকে বাংলাদেশে বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে। পথেঘাটে লাশ পড়ে থাকতে দেখা যায়। তাড়াহুড়ো করে একটা হেলিকপ্টারে চড়ে বসেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। সঙ্গে তার কোনো রাজনৈতিক সহযোগী ছিলেন না। তার কোনো জ্যেষ্ঠ মন্ত্রীও জানতেন না যে, তিনি পালিয়ে যাচ্ছেন। কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই ভারতের মাটিতে পা রাখেন তিনি। এরপর থেকে হাসিনা সেখানেই আছেন।

ছাত্রদের ক্যাম্পাসভিত্তিক একটি আন্দোলন থেকে হাসিনার পতন দাবি পুরো দেশে ছড়িয়ে পড়তে বেশি সময় লাগেনি। লাখো মানুষ হাসিনার পদত্যাগের আওয়াজ তোলেন। দেশে গণতন্ত্র ফিরিয়ে আনার দাবি জানান। আন্দোলনের শুরু থেকেই হাসিনা তা সহিংসতা ও বুলেট দিয়ে মোকাবিলা করার চেষ্টা করেছেন। তার এই শক্তিপ্রয়োগে কয়েক হাজার মানুষ হতাহত হয়।

৫ আগস্ট বিক্ষোভকারীরা শেখ হাসিনার বাসভবনের ঢুকে পড়লে তিনি দেশ ছেড়ে পালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। তার এ সিদ্ধান্ত বাংলাদেশজুড়ে উৎসবে পরিণত হলেও নয়াদিল্লির জন্য হাসিনা সরকারের পতন বিপর্যয়ের চেয়ে কম কিছু ছিল না।

ভারত দীর্ঘদিন ধরেই শেখ হাসিনার ঘনিষ্ঠ সহযোগী। এর আগেও তিনি একবার সে দেশে আশ্রয় নিয়েছিলেন। ১৯৭৫ সালে শেখ হাসিনার পিতা মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্বদানকারী নেতা শেখ মুজিবুর রহমানকে হত্যা করা হলে হাসিনা, তার স্বামী ও সন্তানেরা ভারতে আশ্রয় নেন। ১৯৮১ সালে দেশে ফিরে আসেন শেখ হাসিনা।

দিল্লিতে বিজেপি ও কংগ্রেস—দুই দলের সঙ্গেই ব্যক্তিগতভাবে ভালো সম্পর্ক রয়েছে শেখ হাসিনার। তার সম্পর্কের কারণেই ভারতের ঘনিষ্ঠতম এবং সবচেয়ে অনুগত আঞ্চলিক মিত্র বাংলাদেশ। ভারতের প্রতিবেশী দেশগুলোর মধ্যে একমাত্র বাংলাদেশের সঙ্গেই তাদের বন্ধুত্বের সম্পর্ক ছিল। তারা চীনের কাছ থেকেও বাংলাদেশকে সরিয়ে রাখার সবরকম চেষ্টা করে। হাসিনা ১৯৯৬ সাল থেকে ২০০১ সাল পর্যন্ত এবং পরবর্তীকালে ২০০৯ সাল থেকে আগস্ট, ২০২৪ সাল পর্যন্ত তার শাসনামলে অর্থনৈতিক ও নিরাপত্তা ইস্যুতে ভারতের সঙ্গে সব ধরনের সহযোগিতার সম্পর্ক বজায় রেখে চলেছেন। এসময় তিনি ভারতের সঙ্গে পানিচুক্তির পাশাপাশি ভারতীয় ব্যবসায়ীদের বাংলাদেশে লোভনীয় চুক্তি পাওয়ার ব্যাপারে সহায়তা করেন।

এসব সুবিধার বিনিময়ে ভারত শেখ হাসিনার শাসনামলে তার সব ধরনের নিপীড়ন ও স্বৈরাচারী আচরণের দিক থেকে দৃষ্টি ঘুরিয়ে রাখে। হাসিনার শাসনামলের প্রায় পুরো সময় আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় অভিযোগ করে যে, হাসিনাকে ক্ষমতায় রাখার জন্য ভারতের কর্মকর্তা ও মন্ত্রীরা নিয়মিত বাংলাদেশের নানা ইস্যুতে হস্তক্ষেপ করেছেন। একই সঙ্গে তারা অন্য দেশের ওপর হাসিনার নেতৃত্ব মেনে নেওয়ার জন্য চাপ প্রয়োগ করে।

কূটনৈতিক সূত্র অনুসারে, ২০২৪ সালের গোড়ার দিকে বাংলাদেশে যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়, সেখানে হাসিনার ওপর থেকে যুক্তরাষ্ট্রের চাপ কমাতে দিল্লি ওয়াশিংটনের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ককে ব্যবহার করে। ওই নির্বাচনের কয়েক মাস আগে থেকেই বাংলাদেশে নিযুক্ত যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত পিটার হাস এবং দক্ষিণ এশিয়া-বিষয়ক যুক্তরাষ্ট্রের সহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডোনাল্ড লু একটি স্বচ্ছ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন আয়োজনে তৎপরতা শুরু করেন।

এই তৎপরতায় হস্তক্ষেপ করে ভারত। জানা গেছে, সে সময় যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিনকেন ওই দুইজনকে বাধা দিয়ে বলেন—'বাংলাদেশের বিষয়টি আপাতত বন্ধ থাকুক।' সে সময় যুক্তরাষ্ট্রের সমর্থন পাওয়ায় বিরোধী দলগুলো নিরপেক্ষ নির্বাচনের আশায় উজ্জীবিত হয়ে উঠেছিল। তবে তেমন কিছু আর ঘটেনি। হাসিনা নির্বিঘ্নে ক্ষমতায় ফেরেন। যদিও নির্বাচনে বড়ো ধরনের অনিয়মের বহু অভিযোগ ওঠে।

দুই দেশের মধ্যে গত ১৫ বছর ধরে এক অপ্রচলিত ধরনের সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। ধীরে ধীরে যে সম্পর্ক বাংলাদেশের জন্য ভয়ের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

এক ঝুড়িতে সব ডিম

বাংলাদেশের ইনস্টিটিউট অব পিস অ্যান্ড সিকিউরিটি স্টাডিজের জ্যেষ্ঠ ফেলো শাফকাত মুনির বলেন—'ভারত-বাংলাদেশের সম্পর্ক হচ্ছে এক দেশের সঙ্গে একটি দলের সম্পর্ক।'

আরও কয়েকজন বিশ্লেষকও একই কথাই মনে করেন। হাসিনার পতন ঘটানো গণতান্ত্রিক আন্দোলনের পর মুনির ভারতকে বাংলাদেশের ব্যাপারে দৃষ্টিভঙ্গি পালটানোর আহ্বান জানান। নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বে অন্তর্বর্তী সরকার ব্যাপক সংস্কারের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। একই সঙ্গে হাসিনা সরকারের বিরুদ্ধে ওঠা নানা অভিযোগেরও বিচার নিশ্চিত করা হবে বলে জানিয়েছেন তিনি।

মুনির বলেন—'শেখ হাসিনার পতন মেনে নিতে হবে ভারতকে। তিনি এখন ইতিহাস। নতুন করে আবার সম্পর্ক শুরু করতে হবে। দুটি দেশের মধ্যকার সম্পর্ক সরকার পরিবর্তনের ওপর নির্ভর করতে পারে না।'

ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কে আরেকটি বিষয় ছায়া ফেলতে পারে, তা হলো—হাসিনার ভারতে অবস্থান। যদিও তার পরিবার বলছে, বিষয়টি সাময়িক। আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশের তরফ থেকে তাকে ফেরানোর জন্য প্রত্যর্পণের অনুরোধও ভারতের কাছে জানানো হয়নি। যদিও দেশের ভেতর থেকে তাকে ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে মানবাধিকারকর্মী ও রাজনৈতিক বিরোধীরা বারবার অনুরোধ জানিয়ে আসছে।

সাবেক প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে হত্যা-গুমসহ নানা অভিযোগে এরই মধ্যে শতাধিক মামলা করা হয়েছে। বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল তার বিরুদ্ধে গণহত্যা ও মানবতাবিরোধী অপরাধের অভিযোগ তদন্ত শুরু করেছে। শেষের অভিযোগগুলো আনা হয় সাম্প্রতিক আন্দোলনে নিহতদের ঘটনাকে কেন্দ্র করে। হাসিনা সরকার অবশ্য এর আগে মানবাধিকার লঙ্ঘনের সব অভিযোগ অস্বীকার করে। বাংলাদেশ সরকার এরই মধ্যে হাসিনার আন্তর্জাতিক পাসপোর্ট প্রত্যাহার করেছে, এটি ব্যবহার করেই ভারতে পালিয়ে যান তিনি।

এ সপ্তাহে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের (বিএনপি) নেতা মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর ভারতের প্রতি শেখ হাসিনাকে ফেরত পাঠানোর আহ্বান জানান। তিনি অভিযোগ করেন, হাসিনার ভারতে নিরাপদে অবস্থান করে

বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারকে অস্থিতিশীল ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে অস্থিতিশীল করার চেষ্টা করছেন।

তিনি আরও বলেন—'আমরা আপনাদের প্রতি অনুরোধ জানাচ্ছি, আপনারা তাকে বৈধভাবে বাংলাদেশ সরকারের কাছে ফিরিয়ে দিন। এ দেশের মানুষ তার বিচার করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তাকে বিচারের মুখোমুখি হওয়ার সুযোগ করে দিন।'

বাংলাদেশ নিয়ে বিশেষভাবে ধারণা রাখেন ইলিনয় স্টেট ইউনিভার্সিটির রাষ্ট্রবিজ্ঞানী আলী রীয়াজ। তিনি বলেন—'ভারতের গোয়েন্দা তথ্যে বেশ ঘাটতি ছিল। বিষয়টি তাদের জন্য বিব্রতকর। তারা হাসিনার পতনের বিষয়টি আঁচ করতে পারেনি। একেবারে অপ্রস্তুত অবস্থায় একটি গুরুত্বপূর্ণ আঞ্চলিক পরিবর্তনের মুখে পড়ে তারা। একই সময় বাংলাদেশে ভারতবিরোধী আবেগও বাড়তে থাকে।'

তিনি আরও বলেন—'বাংলাদেশ প্রসঙ্গে খুবই অদূরদর্শী নীতি গ্রহণ করে ভারত। রাষ্ট্রের সঙ্গে রাষ্ট্রের সম্পর্কের পরিবর্তে তারা তাদের সব ডিম রাখে হাসিনা ও তার দলের ঝুড়িতে। ফলে নিজেদের তৈরি করা পরিস্থিতিতেই বিপদে পড়েছে ভারত।'

হাসিনার পতনের পর গত কয়েক সপ্তাহে বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক সংস্কারের ব্যাপারে মোদি সরকার কার্যকর কোনো পদক্ষেপ নিতে পারেননি। তার পরিবর্তে অস্থিতিশীলতা ও হিন্দুসংখ্যালঘুরা যে হুমকির মুখে পড়েছেন, তা নিয়ে 'গভীর উদ্‌বেগ ' প্রকাশ করেছেন।

এ সপ্তাহে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের সঙ্গে ফোনালাপের পর আবারও একই উদ্‌বেগের কথা জানিয়ে বিবৃতি দেন মোদি। তবে যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ থেকে দেওয়া বিবৃতিতে বাংলাদেশ প্রসঙ্গ আসেনি। ভারতীয় পক্ষ থেকে বলা হয়, দুই নেতা বাংলাদেশের পরিস্থিতি দ্রুত স্বাভাবিক করা এবং আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতির ওপর জোর দিয়েছেন।

ভারতের এই অবস্থান সীমান্তের অপর পাশ থেকে মোটেই ইতিবাচকভাবে নেওয়া হয়নি।

আন্দোলনকারীদের সমর্থনে সেনাপ্রধানকে রাজি করান

বাংলাদেশের তরুণ সেনা কর্মকর্তারা

THE WALL STREET JOURNAL.

(*ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল*-এ ২৯ আগস্ট *ইয়াং অফিসার্স ইন বাংলাদেশ'স আর্মি পারসুয়াডেড চিফস টু ব্যাক প্রটেস্টার্স* শিরোনামে নিবন্ধটি ছাপা হয়। লিখেছেন সৈয়দ জেইন আল মাহমুদ।)

বাংলাদেশে ছাত্রদের আন্দোলন দমন করতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সেনা মোতায়েন করার পর থেকেই অস্বস্তিকর গুঞ্জন শুরু হয়। এমন পরিস্থিতিতে অভ্যন্তরীণ টাউন হলে সম্মেলনের ডাক দেন দেশের নবনিযুক্ত সেনাপ্রধান।

৩ আগস্ট সেনাপ্রধান ওয়াকার-উজ-জামান এই বৈঠকের আয়োজন করেন। এ বৈঠকে সেনা মোতায়েনের পক্ষে বেশ কিছু যুক্তি দেন তিনি। একই সঙ্গে কয়েকজন জুনিয়র কর্মকর্তাকে তাদের অবস্থান প্রকাশেরও সুযোগ দেন।

এ সময় মেজর থেকে কর্নেল র‍্যাংকের একের পর এক কর্মকর্তা শিক্ষার্থীদের বিরুদ্ধে শক্তিপ্রয়োগের বিরুদ্ধে তাদের মনোভাব তুলে ধরেন। সেনাপ্রধান বৈঠকের শেষে জানান, সেনাবাহিনী বাংলাদেশের জনগনের সঙ্গে থাকবে। ওই বৈঠকে উপস্থিত কয়েকজন কর্মকর্তার কাছ থেকে জানা যায় এ তথ্য। এই বৈঠকের মাত্র দুই দিনের মাথায় টেলিভিশনে দেওয়া এক ভাষণে শেখ হাসিনার পদত্যাগ করে পালিয়ে যাওয়ার খবর ঘোষণা করেন সেনাপ্রধান।

সেনাবাহিনীর তরুণ কর্মকর্তারা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে আন্দোলনরত শিক্ষার্থী ও জনগণের আবেগের গতিপ্রকৃতির ওপর নজর রাখছিলেন। এই তরুণ কর্মকর্তারাই তাদের সিনিয়রদের এ ব্যাপারে অবহিত করেন। অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মেজর জেনারেল নাইম আশফাক চৌধুরী এ বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। শেখ হাসিনার এক চাচাতো বোনের স্বামী সেনাপ্রধান ওয়াকার। শুরুতে ধারণা করা হয়েছিল, তিনি এই স্বৈরাচারী নেত্রীর খুব ঘনিষ্ঠবৃত্তের মানুষ।

আশফাক চৌধুরী বলেন—'সংকট বাড়তে শুরু করলে সেনাবাহিনীর মধ্যে একধরনের পরিবর্তন দেখা দেয়। সেনাপ্রধান বুঝতে পারছিলেন, পুরো দেশের মানুষের মধ্যে এক অদ্ভুত ঐক্য স্থাপিত হয়েছে। মধ্যম পর্যায়ের কর্মকর্তাদের মধ্যেও হাসিনার অজনপ্রিয়তার বিষয়টিও স্পষ্ট হয়ে যায়। একই সঙ্গে অতিরিক্ত শক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে আন্দোলন দমন করার চেষ্টা নিয়ে আন্তর্জাতিক অঙ্গনের তীব্র সমালোচনার বিষয়টিও তার মাথায় ছিল।'

এ সময় থেকেই সেনাবাহিনী ছাত্রনেতাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রেখে চলতে শুরু করে। পরে প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে নোবেলজয়ী ড. মুহাম্মদ ইউনূসের প্রতিও তাদের সর্বোচ্চ সমর্থনের কথা জানান।

আন্দোলনকারীদের ব্যাপারে তরুণ সেনা কর্মকর্তাদের সহানুভূতি এবং আন্তর্জাতিক চাপের কারণে সেনাবাহিনী পর্দার আড়ালে থেকেই তাদের ভূমিকা পালনে অধিক আগ্রহী হয়ে ওঠে। তারা সরাসরি সরকার পরিচালনায় আসেনি।

সরকারি চাকরিতে কোটাব্যবস্থা নিয়ে আদালতের একটি রায়ের পর গত জুলাই মাসে দেশজুড়ে আন্দোলন শুরু হয়। সরকারি চাকরির ব্যাপারে বাংলাদেশি তরুণদের আগ্রহ সীমাহীন। এর একটি বড়ো কারণ দেশটিতে তরুণ বেকারের হার গণনা করা হয় দুই অঙ্কের সংখ্যায়। সরকার শক্তহাতে এই আন্দোলন দমনের চেষ্টা চালায়, যা শেষ পর্যন্ত সরকারের বিরুদ্ধে একটি গণ-অভ্যুত্থানে পরিণত হয়। আন্দোলনের চূড়ান্ত ফল হিসেবে ক্ষমতা ছাড়তে বাধ্য হন শেখ হাসিনা। ২০০৯ সাল থেকে তিনি ক্ষমতায় ছিলেন। মধ্য জুলাই থেকে তীব্র হয়ে ওঠা এ আন্দোলনে পাঁচ শতাধিক মানুষ নিহত হন।

আশফাক চৌধুরী জানান—'ক্ষমতাসীনদের রক্ষায় আরও রক্ত ঝরাতে রাজি ছিলেন না সেনাপ্রধান। ৪ আগস্ট তিনি পদত্যাগের ব্যাপারে হাসিনাকে রাজি করানোর চেষ্টা শুরু করেন। আর এর প্রধান কারণ ছিল হাসিনার নিরাপত্তা।'

এ ক্ষেত্রে সেনাপ্রধান ওয়াকারকেও অত্যন্ত কৌশলে এগোতে হচ্ছিল। কারণ, সেনাবাহিনীর উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের মধ্যে হাসিনা অনুগতদের সংখ্যা কম ছিল না। চৌধুরী আরও জানান—'সেনাপ্রধান বেশ কয়েকজন শীর্ষপর্যায়ের কর্মকতাকে কিছুটা দূরে রেখেছিলেন। হাসিনার ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত এক কর্মকর্তাকে বরখাস্তও করেন তিনি।'

সেনাবাহিনীর বর্তমান অবস্থান কতদিন অব্যাহত থাকবে, তা-ও নিশ্চিত করে বলা সম্ভব না। বর্তমানে ইউনূস সরকারের সামনেও বহু চ্যালেঞ্জ। আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি এখনও ভঙ্গুর। পুলিশ এবং সরকারি আরও বহু সংস্থার কর্মকর্তারা পালিয়ে বেড়াচ্ছেন।

২৫ আগস্ট থেকে সচিবালয়ের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য সেনা মোতায়েন করা হয়। ওই দিনই চাকরি জাতীয়করণ ও বেতন বাড়ানোর দাবিতে আনসার সদস্যদের সঙ্গে শিক্ষার্থীদের সংঘর্ষ হয়।

ঢাকার একজন রাজনৈতিক বিশ্লেষক জাহেদুর রহমান মনে করেন—'সেনাবাহিনী এখন পেছনের আসনে চলে গেছে। তারা চায়, শিক্ষার্থী-সমর্থিত অন্তর্বর্তী সরকারই এই দেশ পরিচালনা করুক। তবে যতই দিন যাচ্ছে, তাদের এই সরকারের সঙ্গে সম্পৃক্ততা বাড়ছে।'

তিনি বলেন—'রাষ্ট্রের নিরাপত্তাবিধানসহ অন্য ক্ষেত্রে যে দায়িত্ব রয়েছে, তা শিক্ষার্থীরাই করে দেবে; এমনটা আমরা আশা করতে পারি না। নিরাপত্তা পরিস্থিতির অবনতি হলে সেনা হস্তক্ষেপ হয়তো আরও বাড়বে।'

আশফাক চৌধুরীর মতো অনেকেই মনে করেন, সেনাবাহিনী ক্ষমতা দখল করতে চায় না। কারণ তারা মনে করে, বিষয়টি দেশে-বিদেশে কেউই সুনজরে দেখবে না। মার্শাল ল জারি করার পরিকল্পনা নেই তাদের।

ড. মুহাম্মদ ইউনূস বিশ্বজুড়ে একজন সম্মানিত ব্যক্তি। সেনাবাহিনী চায়, ড. ইউনূসের ইমেজকে ব্যবহার করে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে ভেঙে পড়া সম্পর্ক মেরামত করে নিতে।

বাংলাদেশের বেশিরভাগ মানুষই মনে করেন, হাসিনার ১৫ বছরের শাসনামলে সেনাবাহিনী সেই অল্প কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের একটি, যারা ন্যূনতম মাত্রার স্বাধীনতা উপভোগ করেছে। সমালোচকরা বলছেন, এই বাহিনীর ঊর্ধ্বতন প্রায় সব কর্মকর্তাই আওয়ামী লীগের অনুমোদনসাপেক্ষে নিয়োগপ্রাপ্ত।

এ বছর যুক্তরাষ্ট্র সাবেক সেনাপ্রধান জেনারেল আজিজ আহমেদকে কালো তালিকাভুক্ত করে। তার বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ রয়েছে। তবে এই সেনা কর্মকর্তা তার বিরুদ্ধে আনা সব অভিযোগই মিথ্যা বলে নাকচ করে দেন।

এর আগে ২০২১ সালে যুক্তরাষ্ট্র র‍্যাবকে কালো তালিকার অন্তর্ভুক্ত করে। র‍্যাবের বিরুদ্ধে গুরুতর মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ রয়েছে। এই বাহিনী গুম, খুন, বিচারবহির্ভূত হত্যা চালাত বলেই অভিযোগ দীর্ঘদিন ধরে। ওই সময় বাংলাদেশ পুলিশ অ্যাসোসিয়েশন দাবি করে, এই নিষেধাজ্ঞা একেবারেই অপ্রয়োজনীয়।

সরকার গত সপ্তাহে একজন অবসরপ্রাপ্ত বিচারকের নেতৃত্বে একটি ৫ সদস্যবিশিষ্ট তদন্ত কমিশন গঠন করে। এই কমিশনের কাজ হবে, হাসিনার আমলে ঘটে যাওয়া গুমের ঘটনার তদন্ত করা।

সামরিক বাহিনীর গণসংযোগ অধিদপ্তর ইন্টার সার্ভিসেস পাবলিক রিলেশন্স জানায়—'এই কমিশনকে পূর্ণাঙ্গ সহযোগিতা দেবে সেনাবাহিনী।' এক সেনা মুখপাত্র জানান—'দোষী সাব্যস্ত হলে তিনি যে-ই হোন-না কেন, তাকে আইন অনুসারে বিচারের সম্মুখীন করা হবে।'

রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের ধারণা, বিক্ষোভে কঠোর ব্যবস্থা না নিতে সেনাবাহিনীর প্রতি জাতিসংঘের তরফ থেকে একধরনের চাপ ছিল।

জাতিসংঘের শান্তিরক্ষী বাহিনীতে বাংলাদেশের সেনা কর্মকর্তাদের বড়ো ধরনের অংশগ্রহণ রয়েছে। বাংলাদেশের সেনাবাহিনীতে একে একটি লোভনীয় সুযোগ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। কারণ, এতে বেশ উচ্চহারে আয়ের সুযোগ রয়েছে সেনাসদস্যদের।

জুলাইয়ের শেষদিকে জাতিসংঘের লোগো অঙ্কিত সাঁজোয়া যান দেখা যায় ঢাকার রাস্তায়। বিষয়টি নিয়ে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখায় জাতিসংঘ মহাসচিবের দপ্তর।

হাসিনার পদত্যাগের মাত্র একদিন আগে যুক্তরাষ্ট্র, বিভিন্ন মানবাধিকার গোষ্ঠী এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নের সঙ্গে সুর মিলিয়ে জাতিসংঘও বিক্ষোভ দমন করতে সরকারের অতিরিক্ত শক্তিপ্রয়োগের তীব্র ভাষায় সমালোচনা করে। জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার আহ্বান জানান জাতিসংঘের মানবাধিকার-বিষয়ক হাইকমিশনার ভলকার তুর্ক।

এ সময় বাংলাদেশের অবসরপ্রাপ্ত সেনা কর্মকর্তারাও সেনাবাহিনীকে রাস্তা থেকে সরিয়ে নেওয়ার আহ্বান জানান। তবে তার আগেই বিক্ষোভ দমনে

মোতায়েন করা সেনাসদস্যদের ভূমিকায় চোখে পড়ার মতো পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। ঢাকার আইনের ছাত্র আরিফুর রহমান বিক্ষোভের পুরো সময় রাস্তায় ছিলেন। তিনি বলেন, সেনাসদস্যরা রাস্তার একপাশে দাঁড়িয়ে থাকতেন। তারা পুলিশের সঙ্গে টহলে যোগ দিতেন না।

৪ আগস্ট ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ তার সমর্থকদের উদ্দেশে এই আন্দোলন প্রতিহত করার আহ্বান জানায়। তারা মনে করে, এটা সরকারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র। হাসিনা দেশ ছেড়ে পালানোর পরও শতাধিক মানুষ নিহত হয়েছে। পুলিশ না থাকায় সে সময় দেশে অরাজক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়।

ওই রাতে উর্দিপরা নৌবাহিনীর এক কর্মকর্তা ফেসবুকে একটি ভিডিও পোস্ট করেন। সেখানে তিনি তার সহকর্মীদের এই বিক্ষোভে যোগ দেওয়ার আহ্বান জানান। তিনি বলেন—'যথেষ্ট হয়েছে। এবার সবাই মিলে প্রতিরোধ করতে হবে।'

৫ আগস্ট যখন লাখো ছাত্র-জনতা প্রধানমন্ত্রীর বাড়ির দিকে রওনা হন, তখনও রাস্তায় সেনা মোতায়েন ছিল। ওই দিন অনেকেই সেনাসদস্যদের সঙ্গে কথা বলার জন্য দাঁড়িয়েছেন। তারা ফুল বা পানি দিয়েছেন। রহমান বলেন—'আমরা নিশ্চিত হতে পারছিলাম না, সেনাসদস্যরা কার পক্ষে। আমরা ভাবছিলাম সেনাসদস্যদের মানসিকভাবে ব্ল্যাকমেইল করা যায় কি না। আমি ঠিক করেছিলাম তাদের বলব, আপনারা কিন্তু এ মাটিরই সন্তান।'

তবে এটা স্পষ্ট ছিল, সেনাসদস্যদের মনোভাব পালটেছে। দুপুর গড়াতে গড়াতেই সেনাসদস্যরা একপাশে সরে যায়। জনতা ব্যারিকেড সরিয়ে সামনে এগিয়ে যায়। এর মধ্যেই খবর ছড়িয়ে পড়ে শেখ হাসিনা পদত্যাগ করে পালিয়ে গেছেন।

রাজনৈতিক বিশ্লেষক জাহেদুর রহমান বলেন—'বাংলাদেশের সেনাবাহিনীর এক ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত ছিল ওটা। নানা অনিশ্চয়তার পর শেষ পর্যন্ত চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয় তারা।'

NEVER
KILL THE
REVOLUTION

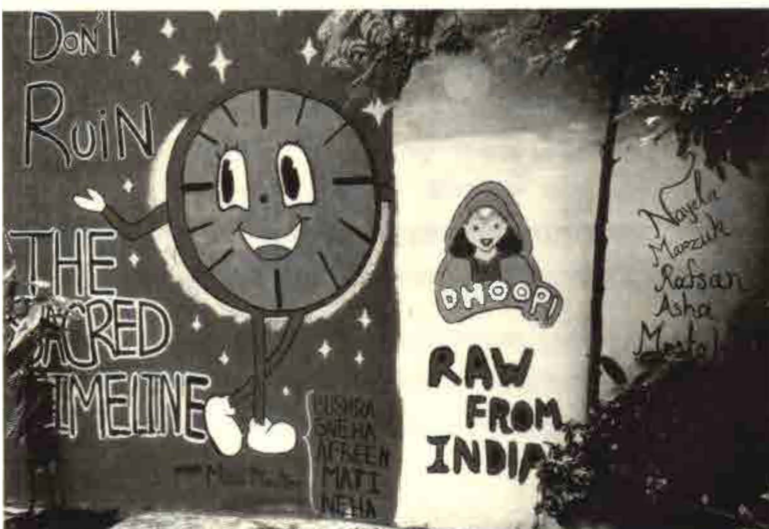
DON'T
RUIN
THE
SNEHA
AFREEN
MATI
NEHA
DHOOPI
RAW
FROM
Nayela
Marzuk
Rafsan
Asha

মুহাম্মদ ইউনূস, নোবেল লরিয়েটের কাঁধে বাংলাদেশকে রক্ষার দায়িত্ব

The Daily Telegraph

(২০ আগস্ট, ২০২৪ তারিখে *দ্য ডেইলি টেলিগ্রাফ* পত্রিকায় এই নিবন্ধটি প্রকাশিত হয়। অ্যাস্ট্রোস ইভান্স প্রিটচার্ডের লেখা নিবন্ধটি শিরোনাম ছিল *মুহাম্মদ ইউনূস, দ্য নোবেল সেইন্ট ড্যাফটেড ফর সেফ বাংলাদেশ*)

ড. মুহাম্মদ ইউনূস। এই নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ ও ব্যাংকার পুরো বিশ্বের কাছে যতটা সমাদৃত, ঠিক ততটাই অসম্মানিত ছিলেন সালাফি মৌলবাদী এবং শেখ হাসিনার প্রশাসনের কাছে।

গ্রামীণ ব্যাংক নাম দিয়ে ক্ষুদ্রঋণ প্রকল্প চালু হয় ১৯৭৬ সালে। গ্রামীণ ব্যাংক দরিদ্রদের মধ্যে দরিদ্রতমকে খুঁজে বের করে, যাদের ঋণগ্রহীতাদের ৯৭ শতাংশই নারী।

লিন্ডাও নোবেল ফোরামে একবার তার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল। সেসময় তিনি আমাকে বলেন—'কট্টর ডানপন্থি ধর্মীয় গোষ্ঠী আমাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে সামাজিক শৃঙ্খলা লঙ্ঘনের। তাদের অভিযোগ—নারীদের ঋণ দেওয়ার মাধ্যমে আমরা স্বামীদের অবহেলা করা শিক্ষা দিচ্ছি তাদের।'

তিনি আরও বলেন—'বামপন্থিরাও আমাদের পছন্দ করে না। তাদের ভাষায়, এটা পুঁজিবাদকে তৃণমূল পর্যায়ে ছড়িয়ে দিতে যুক্তরাষ্ট্রের চক্রান্ত। কাজেই সবদিক থেকেই আমরা চাপের মধ্যে আছি। তাদের সবাইকে চেঁচাতে দিন। তারা সবসময় শুধু কথাই বলে; কাজ করে না।'

মহামারি পর্যায়ের দুর্নীতির বিরুদ্ধে কথা বলতে শুরু করলে তার সঙ্গে হাসিনার সম্পর্কের অবনতি ঘটতে শুরু করে। শেখ হাসিনা বিচারব্যবস্থাকে কাজে লাগিয়ে গত জানুয়ারিতে ড. ইউনূসের বিরুদ্ধে 'গরিবের রক্ত চুষে খাওয়ার' দায়ে দোষী সাব্যস্ত করেন। এর আগে তার একটি রাজনৈতিক বিচারকার্যও

সম্পন্ন হয়, যা পুরো বিশ্বে তীব্রভাবে নিন্দিত হয়। হাসিনার বিরুদ্ধে বহু অভিযোগের মধ্যে এটি অন্যতম।

প্রযুক্তিনির্ভর শিক্ষার্থীদের কয়েক সপ্তাহের বিক্ষোভের পর শেখ হাসিনার অবিস্মরণীয় পতন বিশ্বজুড়ে স্বৈরশাসকদের জন্য একটি শিক্ষা হয়ে থাকবে। তাদের মাথায় রাখতে হবে, নিপীড়ন চালিয়ে খুব বেশি দিন ক্ষমতায় টিকে থাকা সম্ভব না।

হাসিনা হয়তো বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উত্থানের কারিগর হিসেবে নিজেকে দাবি করতে পারেন। তবে এটাও সত্যি যে, পুলিশ, র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটেলিয়ন ও আওয়ামী লীগের মিলিশিয়া বাহিনীর ওপর তার শক্ত নিয়ন্ত্রণ ছিল। দেখামাত্র গুলির নির্দেশ দেওয়ার পরও এদের কেউই তাকে রক্ষা করতে পারেনি। দেশের সেনাবাহিনী তার নির্দেশ মানতে অস্বীকৃতি জানায়।

আটলান্টিক কাউন্সিলের সাউথ এশিয়া সেন্টারের আলী রীয়াজ বলেন—'গত দেড় দশকে তিনি ও তার দল যে অজেয় সংস্কৃতির জন্ম দিয়েছেন, তা মাত্র কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই ভেঙে পড়েছে।' অথচ ১৯৯৬ সাল থেকে বেশিরভাগ সময়ই তিনি ক্ষমতায় ছিলেন।

৮৪ বছর বয়সি ড. ইউনূস অনেকটা আকস্মিকভাবেই রাজনৈতিক ক্ষমতার কেন্দ্রে চলে আসেন। এখন ১৭ কোটি মানুষের দেশকে নেতৃত্ব দিচ্ছেন তিনি। তার পদের নাম প্রধান উপদেষ্টা। অনেকটাই লর্ড প্রটেকটরের মতো। তবে তাতে তার দেবতাতুল্য চেহারায় খুব একটা প্রভাব পড়েনি।

জোবরা গ্রামের নারীদের বাঁশের আসবাব বানানোর জন্য ২৭ থেকে ৪২ ডলার ঋণ দিয়ে কার্যক্রম শুরু করে গ্রামীণ ব্যাংক। শহুরে ঋণদাতারা যাদের সহায়তা করত, তাদের বাদ দিয়ে কাজ করে গ্রামীণ ব্যাংক।

তিনি বলেন—'আমাদের ব্যাংকিং ব্যবস্থা উপ-উপ-উপ-উপ-প্রধান। আমাদের চেয়ে কম আপনি আর খুঁজে পাবেন না। আমাদের কোনো জামানত লাগে না, কোনো বীমা লাগে না, কোনো করদাতাদের গ্যারান্টিও লাগে না।'

সাইকেলে করে আমাদের লোকজন যায় দেখতে, যিনি ঋণ চান, তিনি যথেষ্ট গরিব কি না। কোনো নারী যদি এক কক্ষের বাড়িতে থাকেন, তাহলে তিনি ঋণ পাওয়ার যোগ্য।'

৮২ হাজার গ্রামে গ্রামীণ ব্যাংকের ঋণ গ্রহণকারীর সংখ্যার এখন ১০.৬ মিলিয়ন। এদের প্রায় সবাই নারী। কারণ, সে ক্ষেত্রে ঝুঁকি কম থাকে। তিনি বলেন—'নারীদের পরিবারের জন্য ত্যাগের মানসিকতা আছে। পুরো বিশ্বেই আপনি এই প্রবণতা দেখতে পাবেন। পুরুষরা খরচ করতে পছন্দ করে।'...

...কঠোর শৃঙ্খলার ওপর গ্রামীণের মডেল প্রতিষ্ঠিত। গ্রামবাসীরা পাঁচজন মিলে একটি গ্রুপ গঠন করেন। তারা নিজেরাই নেতা নির্বাচন করেন। ঋণগ্রহীতারা '১৬ সিদ্ধান্ত' নামে একটি কোডে সম্মত হন। এই কোডে বলা হয়েছে, সন্তানদের স্কুলে পাঠাতে হবে, যৌতুক দেওয়া যাবে না ইত্যাদি।

প্রতিটি ঋণপ্রকল্পে অবশ্যই অন্যদের সমর্থন থাকতে হবে। সহযোদ্ধাদের চাপে তারা ঋণের কিস্তি পরিশোধে বাধ্য হয়। ২০২৪ সালের জুন পর্যন্ত ঋণ পরিশোধের হার ছিল ৯৬.২৯ শতাংশ।

যুক্তরাষ্ট্রের ভ্যান্ডারবিল্ট ইউনিভার্সিটি থেকে ড. ইউনূস অর্থনীতি নিয়ে লেখাপড়া করেন। সময়টা ছিল ১৯৬০-এর দশক। সেখানেই মার্টিন লুথার কিংকে পান তিনি। ড. ইউনূস বলেন—'বিষয়টি আমাকে পালটে দেয়। আমি দেখলাম একটি মাত্র কণ্ঠ পুরো সমাজকে পালটে দিতে পারে।'

এখন তিনি তার নিজের দেশকে পরিচালনা করবেন। সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা ছাড়াই বাংলাদেশের রাজনীতিকে পালটে দেওয়ার ক্ষমতা রাখেন তিনি। গত সপ্তাহান্তে তিনি 'অবাধ, মুক্ত, অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন' আয়োজনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। তবে তা রাজনৈতিক ভিত পুনর্গঠনের পর।

তিনি বলেন—'শেখ হাসিনার স্বৈরাচারী শাসন দেশের সব প্রতিষ্ঠানকে ধ্বংস করে দিয়েছে। বিচারব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে। ব্যাংকে লুটপাট চালানো হয়েছে। রাষ্ট্রীয় কোষাগার লুণ্ঠিত হয়েছে।'

১৯৭২ সালে হেনরি কিসিঞ্জার বাংলাদেশকে 'তলাবিহীন ঝুড়ি' হিসেবে অভিহিত করেন। তার আগে হাসিনার বাবা শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশ নিয়ে জন্ম হয় বাংলাদেশের। সে সময় দ্বিতীয় দরিদ্র দেশ ছিল দেশটি। বর্তমানে বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার অর্থনৈতিক সাফল্যের একটি গল্প। আমদানি-প্রতিস্থাপন মডেলকে বাদ দিয়ে তারা রপ্তানি-নেতৃত্বাধীন প্রবৃদ্ধি বেছে নিয়েছে।

মুক্তবাজার অর্থনীতিতে বাংলাদেশকে বাঘ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। মাথাপিছু আয়ের দিক থেকে তারা ভারতকে ছাড়িয়ে গেছে, যদিও তা তর্কসাপেক্ষ। তৈরি পোশাক রপ্তানি খাতে তাদের সাফল্য দুর্দান্ত। বিশ্বের মোট তৈরি পোশাকে ১০ শতাংশ বাংলাদেশে প্রস্তুত হয়। জাতিসংঘের দৃষ্টিতে বাংলাদেশ এখন আর স্বল্পোন্নত দেশ নেই। শীঘ্রই শুল্ক সুবিধা হারাবে দেশটি।

তবে বাংলাদেশের বাঘের ভাবমূর্তি এখন কিছুটা ক্ষুণ্ন হয়েছে। ২০০৮ সাল থেকেই তাদের বৈদেশিক ঋণের পরিমাণ বাড়ছে, যা ওই সময় থেকেই ১০ বিলিয়ন ডলারের চেয়ে বেশি। ২০২২ সালে ভ্লাদিমির পুতিন ইউক্রেনে যুদ্ধ শুরু করার পর জ্বালানির দাম বেড়ে গেলে গত ডিসেম্বর থেকে আইএমএফের সহায়তার প্রয়োজন হয় বাংলাদেশের। কয়লার জন্য তারা চীনের ওপর নির্ভর করতে শুরু করে।

ড. ইউনূসের জ্বালানি অর্থনীতির ধারণা কিছুটা ভিন্ন। গ্রামীণ শক্তি নামে তার একটি সংস্থা রয়েছে। তারা গ্রামে জৈব গ্যাস ও সোলার প্যাকেজ বিক্রি করে। আগামী মাসে জাতিসংঘের যে সম্মেলন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে, তার আগে ড. ইউনূসসহ নোবেল লরিয়েটরা জীবাশ্ম জ্বালানি অতিরিক্ত পোড়ানোর বিরুদ্ধে লেখা একটি চিঠিতে সই করেন। পৃথিবীর দক্ষিণ গোলার্ধ থেকে এর আগে আর কোনো নেতা প্রতিবেশ আন্দোলন নিয়ে এত বড়ো পদক্ষেপ নেননি।

ড. ইউনূস কাল্পনিক কোনো চরিত্র নন। তিনি এমন একজন অর্থনৈতিক ব্যক্তিত্ব, যার বিশ্বাস রয়েছে যে, যেখানে প্রশাসনের কারণে পুরো ব্যবস্থা দুর্নীতিগ্রস্ত নয়, সেখানে বাজার ব্যবস্থার পরিবর্তন সম্ভব। তিনি বলেন—'আমি বিশ্বাস করি, সব মানুষই উদ্যোক্তা। দারিদ্র্য উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া কোনো অভিশাপ নয়। সুবিধাবঞ্চিতদের ওপর কৃত্রিমভাবে এটি আরোপ করা হয়।'

ড. মুহাম্মদ ইউনূস বলেন—'একদিন আমরা দারিদ্র্যকে নিয়ে জাদুঘর বানাব। পরবর্তী প্রজন্মের শিশুদের আমরা ওখানে নিয়ে যাব। ওদের দেখাব, দারিদ্র্য কেমন ছিল। তারা এটা বিশ্বাস করবে না। কারও দরিদ্র হওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই।'

ড. ইউনূস নিশ্চিতভাবেই একজন পথপ্রদর্শক ব্যক্তিত্ব।

শেখ হাসিনা : ভারতের দুর্বহ ভার

Le Monde

(*লা মদঁ*-এ ১৫ আগস্ট, ২০২৪ তারিখে এই প্রতিবেদনটি প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল *শেখ হাসিনা, ইন্ডিয়া'স কুমবারসম গেস্ট*)

কখনও কখনও বন্ধুও বোঝা হয়ে যায়। ভারতের জন্য এখন শেখ হাসিনা ঠিক তেমনই একটি দুর্বহ ভার। যতই দিন গড়াচ্ছে, ততই ভারতের পক্ষে শেখ হাসিনাকে বহন করা কঠিন থেকে কঠিনতর হয়ে যাচ্ছে। ছাত্র-জনতার গণ-অভ্যুত্থানের মুখে গত ৫ আগস্ট ক্ষমতা ছেড়ে ভারতে পালিয়ে যান সদ্য সাবেক এই প্রধানমন্ত্রী। তাকে আশ্রয় দিতে কয়েকটি দেশ অস্বীকৃতি জানানোর পর ভারতে থেকে যান তিনি। ঢাকায় এরই মধ্যে তার বিরুদ্ধে আন্দোলনের সময় নিহত এক ব্যক্তিকে হত্যার দায়ে মামলা শুরু হয়েছে। ওই আন্দোলনে সাড়ে চারশর অধিক মানুষ নিহত হয়।

হাসিনা নিজে যে পতনের পর থেমে গেছেন, তা কিন্তু নয়। বরং ছেলে সজীব ওয়াজেদ জয় তার এক্স হ্যান্ডেল থেকে তার মায়ের নামে সম্প্রতি একটি বার্তা প্রচার করেন। এতে সাবেক প্রধানমন্ত্রী ছাত্র আন্দোলন চলাকালে হত্যাকাণ্ডের ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত দাবি করেছেন। একই সঙ্গে তিনি সমর্থকদের প্রতি ১৫ আগস্ট ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জাদুঘরে সমবেত হওয়ার আহ্বান জানান। প্রতিবাদ সমাবেশ আয়োজন করতে বলেন তাদের। তবে ওই দিন ৩২ নম্বরে স্বল্পসংখ্যক আওয়ামী লীগের নেতাকর্মী জড়ো হলেও তারা সমাবেশ করতে পারেনি। সেখানে লাঠিসোঁটা নিয়ে বৈরীভাবাপন্ন জনতা আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের দাঁড়াতেই দেয়নি।

১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় থাকার সময় হাসিনা ১৫ আগস্টকে জাতীয় ছুটি ঘোষণা করেন। ওইদিন তার বাবার মৃত্যুবার্ষিকী। ১৯৭৫ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের এই নেতাকে হত্যা করে একদল সেনা কর্মকর্তা। ড. ইউনূস ক্ষমতায় এসেই ১৫ আগস্টের ছুটি বাতিল করেন।

ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী জানান, শেখ হাসিনা ভারতে 'সাময়িক সময়ের জন্য' অবস্থান করবেন। তবে তার ভারতে থাকার মেয়াদ যে খুব সংক্ষিপ্ত হবে না, তা এরই মধ্যে স্পষ্ট হয়ে গেছে। কারণ, হাসিনা যেতে চেয়েছেন এমনসব দেশই তাকে অভিবাসন দিতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র তার ভিসা বাতিল করে দিয়েছে। তবে ভারতে তিনি কোথায় থাকেন, সে ব্যাপারে কিছু জানা যায়নি। ভারতের সংবাদমাধ্যম জানায়, ৫ আগস্ট শেখ হাসিনা একটি বিমানে করে দিল্লির পার্শ্ববর্তী গাজিয়াবাদের হিন্দোল সামরিক ঘাঁটিতে অবতরণ করেন। ভারতের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত দোভাল তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। অজিত দোভালের সঙ্গে দেশটির প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিও অত্যন্ত সদভাব আছে।

মিথ্যা তথ্য

শেখ হাসিনা অবশ্য খুব ভালো করেই জানেন, তিনি তার মেজবানের ওপর ভরসা রাখতে পারেন। ২০১৪ সালে নরেন্দ্র মোদি ক্ষমতায় আসার পর থেকেই দুজনের মধ্যে সম্পর্ক অতি ঘনিষ্ঠ। সর্বশেষ এ বছর মোদি নির্বাচিত হওয়ার পর বাংলাদেশের এই সাবেক প্রধানমন্ত্রী ছিলেন তার প্রথম বিদেশি রাষ্ট্রীয় অতিথি। পশ্চিমা বিশ্বে শেখ হাসিনাকে নিকট অতীতে সম্বোধন করা হতো 'লৌহমানবী' নামে। এই স্বৈরাচারী নারীনেত্রীর কখনও কোনো ত্রুটি খোঁজার চেষ্টা করেননি মোদি। তার 'প্রতিবেশী প্রথম' নীতিতে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব পেয়েছে বাংলাদেশ। যেমন চীনের কাছে পাকিস্তান। মোদির উদ্‌বেগ ছিল বাংলাদেশে ইসলামপন্থি এবং ভারতের উত্তর-পূর্বের সন্ত্রাসী গ্রুপগুলোকে নিয়ে। ভুলে গেলে চলবে না, বাংলাদেশের সঙ্গে ভারতের চার হাজার কিলোমিটার সীমান্ত রয়েছে।

দিল্লি দাবি করে আসছে—এর বিনিময়ে ঢাকার সঙ্গে বাণিজ্য চুক্তি, সড়ক ও রেলপথে যোগাযোগ সম্প্রসারণ, স্বল্প সুদে ঋণ এবং বাংলাদেশের দারিদ্র্য দূরীকরণে সহায়তা করেছে বলে।

শেখ হাসিনার সব কাজে দিল্লির লাগামহীন প্রশ্রয় বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের মধ্যে ভারতবিদ্বেষ বাড়িয়ে দেয়। বিরোধী দলগুলো মনে করে, ঢাকার অভ্যন্তরীণ বিষয়গুলোতে নাক গলাচ্ছে দিল্লি। এমন অভিযোগও রয়েছে, গত

নির্বাচনের সময় ভারতের গোয়েন্দা সংস্থা 'র' আওয়ামী লীগের হয়ে কাজ করেছে। ভারতের জিন্দাল ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক শ্রীরাধা দত্ত দুই দেশের বর্তমান সম্পর্ক নিয়ে দ্য ডিপ্লোম্যাটিক ওয়েবসাইটে লেখা এক উপসম্পাদকীয়তে লেখেন—'ভারত বাংলাদেশের সব দলের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে আওয়ামী লীগকে সমর্থন করেছে। এখন তাদের ভূমিকায় পরিবর্তন আনতে হবে। এবার তাদের নীতিগত সব বিষয় নিয়ে কাজ করতে হবে বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের সঙ্গে।'

শ্রীরাধার সঙ্গে ঐকমত্য পোষণ করেন বেসরকারি সংগঠন ক্রাইসিস গ্রুপের থমাস কিন। তিনি মনে করেন, ভারতকে এখন তার আচরণে সতর্ক হতে হবে। কোনোভাবেই যেন তাদের আচরণে এমন কোনো মনোভাব প্রকাশ না পায় যে, তারা বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারকে অবমূল্যায়ন করছে। সে ক্ষেত্রে বাংলাদেশের জনগণের ইচ্ছার প্রতিও অসম্মান প্রদর্শন করা হবে।

৮ আগস্ট ড. ইউনূস ক্ষমতা গ্রহণ করার পর নরেন্দ্র মোদি প্রথম বিদেশি নেতা হিসেবে তাকে অভিনন্দন জানান। তবে ভারতীয় প্রচারমাধ্যমের ভূমিকা এতটা ইতিবাচক ছিল না। তারা হাসিনার প্রতি পক্ষপাত প্রদর্শন করতে গিয়ে বাংলাদেশ সম্পর্কে ভয়ংকর কিছু অপতথ্য ছড়াতে থাকে। প্রথমেই তারা দাবি করে, বাংলাদেশে সংখ্যালঘুরা নির্যাতনের শিকার হচ্ছে। যেসব ঘটনা তারা তুলে ধরে তার বেশিরভাগই মিথ্যা বলে এরই মধ্যে প্রমাণিত হয়েছে। তাদের ছড়ানো আরেকটি থিওরি হচ্ছে, বাংলাদেশে গণ-অভ্যুত্থান যুক্তরাষ্ট্র ঘটিয়েছে এবং ড. ইউনূস *সিআইএ*-এর এজেন্ট।

কয়েকটি সংবাদমাধ্যম এক কদম এগিয়ে হাসিনার একটি ভাষণ প্রকাশ করে। তাদের দাবি, ভারতের পালিয়ে যাওয়ার আগে এই ভাষণটি জাতির উদ্দেশে শেখ হাসিনা দিতে চেয়েছিলেন। সময়ের অভাবে দিতে পারেননি। ভারতীয় সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত ভাষণে যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ভয়াবহ কিছু অভিযোগ তোলা হয়। সেখানে দাবি করা হয়, বঙ্গোপসাগরের প্রবাল দ্বীপ সেন্টমার্টিন যুক্তরাষ্ট্রের হাতে তুলে দিতে রাজি না হওয়ার কারণেই ক্ষমতা ছাড়তে হয়েছে হাসিনাকে। তার কথা হলো—যুক্তরাষ্ট্র নজরদারির জন্য সেন্টমার্টিন দ্বীপের দখল নিতে চেয়েছিল। গত মে মাসেও একই অভিযোগ করেন তিনি। তবে তখন সরাসরি যুক্তরাষ্ট্রের নাম উল্লেখ করেননি তিনি। বলেছিলেন—সাদা

চামড়ার দেশ তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে। ক্ষমতাচ্যুত এই প্রধানমন্ত্রী প্রায় দাবি করতেন, যুক্তরাষ্ট্র তার বিরুদ্ধে নানা ধরনের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত রয়েছে। কারণ, যুক্তরাষ্ট্র নানা সময় তার নানা কাজের সমালোচনা করেছে।

তবে তার ছেলে প্রকাশিত এই ভাষণকে ভুয়া বলে উড়িয়ে দিয়েছেন। বিষয়টি নিয়ে মুখ খুলেছে ওয়াশিংটনও। হাসিনা পতনের সঙ্গে তাদের কোনো সম্পর্ক নেই বলে দাবি করে তারা। হোয়াইট হাউসের মুখপাত্র কেরিন জ্যাট পেরি বলেন—'ওই ঘটনার সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের কোনো সম্পৃক্ততা নেই।'

পররাষ্ট্র সম্পর্কে পুনরায় ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা

হাসিনার এই পতন ওই অঞ্চলের ভূরাজনৈতিক কাঠামোতে পরিবর্তন আনবে। এ ঘটনার মধ্যে দিয়ে ভারত তার ঘনিষ্ঠ এক মিত্রকে হারাল। এখন সম্পর্কোন্নয়নের জন্য এগিয়ে আসতে পারে চীন। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে চীনের কাছ থেকেই সবচেয়ে বেশি অস্ত্র কিনেছে বাংলাদেশ। তবে চীনের সঙ্গে হাসিনার সম্পর্ক খুব একটা উষ্ণ ছিল না। চীনা প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং-এর স্বপ্ন প্রকল্প বেল্ট অ্যান্ড রোপ ইনিশিয়েটিভে হাসিনা সই করার পরও দু-দেশের মধ্যে সম্পর্কে খুব একটা প্রভাব পড়েনি।

গত জুলাই মাসে ভারত সফরের পর হাসিনা চীন সফর করেন। ঢাকাসহ পুরো দেশ তখন তীব্র ছাত্র আন্দোলনে উত্তাল। পরপর এই দুই সফরের মধ্যে তিনি ভারত সরকারকে খুশি করতে পারলেও চীনের মন জয় করতে পারেননি। বরং ভারতের প্রতি তার পক্ষপাত তাকে মোদির হাতের পুতুলে পরিণত করেছে বলেই প্রমাণ করে। অন্যদিকে চীন বাংলাদেশকে ঋণ দিতে অস্বীকৃতি জানায়। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে অবশ্য শেখ হাসিনা অতিমাত্রায় ভারতের প্রতি নির্ভরশীল হয়ে পড়েন। এ সময় তিনি মংলা বন্দরের ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব ভারতের হাতে তুলে দেন। তিস্তার পানির ন্যায্য হিস্যা ভারত থেকে চাইতেও গলা তুলতে পারেননি কখনও।

ড. মুহাম্মদ ইউনূস টেনেসির ভ্যান্ডারবিল্ট ইউনিভার্সিটিতে পড়ালেখা করেন। পূর্বসূরির মতো যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বৈরিতা নেই তার। ২০০৯ সালে তিনি যুক্তরাষ্ট্রের সর্বোচ্চ বেসামরিক পুরস্কার মেডেল অব ফ্রিডম লাভ করেন।

ভারতের কুক্ষিগত অবস্থা থেকে বের হয়ে আসার জন্য সম্ভব সবকিছুই করতে চায় এই অন্তর্বর্তী সরকার। পররাষ্ট্রনীতিতে একটি ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা করতে চায় তারা। এ সরকারের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সামলাচ্ছেন কূটনীতিক তৌহিদ হোসেন। বাংলাদেশ–ভারত সম্পর্কের পরিস্থিতি নিয়ে বরাবরই সমালোচনামুখর তিনি। ঠিক যেমন আইন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত উপদেষ্টা আসিফ নজরুলও সমালোচক।

ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক নিয়ে অন্তর্বর্তী সরকারের পরিবেশ-বিষয়ক উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান বলেন—'স্বাধীনতা যুদ্ধে ভারত বাংলাদেশকে সহায়তা করেছিল। কিন্তু আপনি আপনার প্রতিবেশীর ন্যায্য অধিকার আদায়ে সহায়তা করেছেন বলেই তার সব অভ্যন্তরীণ বিষয়ে নাক গলানোর বৈধতা পেয়ে যাননি। আমরা অবশ্যই ভারতের সঙ্গে মসৃণ সম্পর্ক চাই। তবে আমি মনে করি, ভারতের উচিত তাদের পররাষ্ট্রনীতি পুনর্বিবেচনা করা। বাংলাদেশের ব্যাপারে তাদের নীতি পুনর্বিবেচনা করা। তাদের অবশ্যই বাংলাদেশের জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা, ন্যায্য দাবি, অধিকারের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে হবে।'

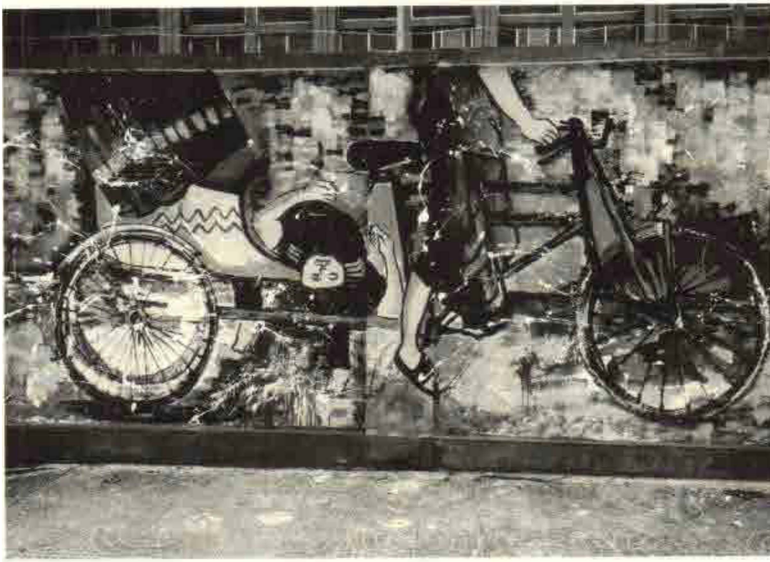

কেন হাসিনা পালাতে বাধ্য হলেন

DAWN

(পাকিস্তানের *ডন* পত্রিকায় ১১ আগস্ট *হোয়াই হাসিনা ওয়াস ফোর্সড টু ফ্লি* শিরোনামে নিবন্ধটি প্রকাশিত হয়। লিখেছেন ইনতিফার চৌধুরী।)

'আমরা স্বাধীন হয়ে গেছি!' ২৬ বছর বয়সি এক যুবক চিৎকার করে এ তথ্য তার চাচাতো ভাইকে জানালেন। স্থান বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকার শাহবাগ এলাকা। তখন দেশটির পার্লামেন্ট হাউজে বসেছে লাখো মানুষের মেলা।

এর কিছুক্ষণের মধ্যেই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম 'নতুন স্বাধীনতা'র খবরে ভেসে যেতে থাকে। ১৫ বছরের স্বৈরাচারী শাসক শেখ হাসিনার বিদায়ের পর এভাবেই উদ্‌যাপন চলছিল। পদত্যাগের গণদাবির মুখে দেশ ছেড়ে পালিয়ে যান হাসিনা। কয়েক সপ্তাহের বিক্ষোভের পর হাসিনা পদত্যাগ করেন। ওই বিক্ষোভে অন্তত ৩০০ জন নিহত এবং কয়েক হাজার মানুষ আহত হয়।

এখন পূর্ববর্তী বৈষম্যমূলক সরকারি ব্যবস্থার বিপরীতে তরুণরা রাজনৈতিক ব্যবস্থায় ভূমিকা রাখার সুযোগ পাবেন। কিন্তু অন্তর্বর্তী সরকার কি তাদের কথা শুনবে? দেশে সত্যিকারের পরিবর্তন নিয়ে আসবে?

তরুণরা বাংলাদেশের নিপীড়ক নেতা শেখ হাসিনার পতন ঘটিয়েছে। এখন কি তারা ক্ষমতায় সত্যিকারের পরিবর্তন আনতে পারবে?

সাম্প্রতিক সপ্তাহগুলোতে কী ঘটেছে

১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী এবং তাদের স্বজনদের জন্য সরকারি চাকরিতে ৩০ শতাংশ আসন রেখে যে কোটাব্যবস্থা করা হয়েছিল, তার বিরুদ্ধে গত মাস থেকে বিক্ষোভ শুরু করে তরুণরা। ছাত্ররা মেধাভিত্তিক ব্যবস্থা প্রবর্তনের দাবি জানায়। তাদের দাবি, কোটাব্যবস্থা অন্যায্য ও পক্ষপাতদুষ্ট।

বিক্ষোভ বাড়তে থাকলে বাংলাদেশের ত্রুটিপূর্ণ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা ভেঙে পড়ে। সরকার মোবাইল ফোনে ইন্টারনেট সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেশজুড়ে কারফিউ জারি করে। দেখামাত্র গুলির নির্দেশ দেওয়া হয়। রাস্তায় পুলিশ ও সেনাবাহিনী মোতায়েন করা হয়।

সরকারের এ কঠোর অবস্থান খুব দ্রুতই বিক্ষোভকে গণ-অভ্যুত্থানে রূপ দেয়। পতন ঘটে শেখ হাসিনা ও তার দল আওয়ামী লীগের।

কয়েক দিনের বিক্ষোভে ছাত্রদের সঙ্গে পুলিশ ও ক্ষমতাসীন দলের সদস্যদের সহিংসতার পর সুপ্রিমকোর্ট মুক্তিযোদ্ধার স্বজনদের জন্য কোটা ৫ শতাংশে নামিয়ে এনে রায় দেয়। এ সিদ্ধান্তও ছাত্রদের শান্ত করতে ব্যর্থ হয়। তারা কয়েক সপ্তাহের সহিংসতায় নিহতদের হত্যাকাণ্ডের তদন্ত এবং বিচার দাবি করতে থাকে।

সরকার এ সময় দোষারোপের খেলা শুরু করে। তাদের অভিযোগ, বিরোধী দল বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) ও জামায়াতে ইসলামী শেখ হাসিনার পদত্যাগের দাবি করেছে।

প্রধানমন্ত্রী বিক্ষোভকারীদের 'সন্ত্রাসী' হিসেবে অভিহিত করে কঠোর হাতে বিক্ষোভ দমনের চেষ্টা শুরু করেন। এরপর ৩ আগস্ট শেখ হাসিনা ছাত্রদের সঙ্গে সংলাপ আয়োজনের ডাক দেন। কিন্তু এক ছাত্র সমন্বয়ক তা প্রত্যাখ্যানের ঘোষণা দেন।

রবিবার ছিল বাংলাদেশের বেসামরিক অসন্তোষের ইতিহাসে এক রক্তক্ষয়ী দিন। এই একদিনেই অন্তত ৯৮ জন নাগরিক নিহত হয়। আহত হয় আরও সহস্রাধিক।

সরকারবিরোধী মনোভাব দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। অভিযোগ ওঠে সরকার ভয় দেখিয়ে আন্দোলন দমনের চেষ্টা শুরু করেছে। হাসপাতালে আহতদের চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে না। এরই মধ্যে গণতান্ত্রিক অধিকার চর্চার অপরাধে (!) হাজারো মানুষকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

অসন্তোষ বাড়তে থাকলে ক্ষমতায় শেখ হাসিনার নিয়ন্ত্রণ দুর্বল হয়ে আসে এবং শেষ পর্যন্ত তিনি পালিয়ে যেতে বাধ্য হন।

গভীর বৈষম্য ও ক্ষোভ

যখন ছাত্ররা কোটাব্যবস্থা নিয়ে বিক্ষোভ শুরু করে, তখনই তারা ব্যাপকভাবে জনসমর্থন পেয়ে যায়। দেশে যে নিপীড়নমূলক রাজনৈতিক পরিবেশ ছিল, তা নিয়ে আগে থেকেই ক্ষোভ ছিল। ক্রমেই দুর্বল হয়ে আসা অর্থনীতি, বৈষম্য, তরুণদের বেকারত্ব ও উচ্চহারে মূল্যস্ফীতির মতো বিষয়গুলো সামাল দিতে সরকারের ব্যর্থতা পরিস্থিতিকে অস্থিতিশীল করে তুলেছিল।

২০০৯ সালে হাসিনা ক্ষমতায় আসার পর থেকে অর্থনৈতিকভাবে বাংলাদেশ অনেকখানি এগিয়েছিল। কিন্তু তারপরও মানুষের মধ্যে ক্ষোভের জন্ম হয়। বাংলাদেশ মূলত তৈরি পোশাক খাতের সাফল্যের জন্যই অর্থনৈতিকভাবে সাফল্য পায়। এ অঞ্চলের অন্যতম দ্রুত বর্ধনশীল অর্থনীতির দেশ ছিল বাংলাদেশ। গত এক দশকে দেশটির মাথাপিছু আয় তিনগুণ বৃদ্ধি পায়। গত ২০ বছরে ২৫ মিলিয়ন মানুষ দারিদ্র্যের কশাঘাত থেকে বের হয়ে আসতে সক্ষম হয়েছে। তবে এই অর্থনৈতিক সাফল্য সমভাবে বণ্টিত হয়নি। আর্থিক সুবিধা ছিল আওয়ামী লীগের ধনীদের হাতে কুক্ষিগত। ধনী ১০ শতাংশ মানুষ দেশের ৪১ শতাংশ সম্পদের মালিক বনে যায়। আর একেবারে তলানিতে থাকা ১০ শতাংশ মানুষের কাছে ছিল মাত্র ১.৩ শতাংশ সম্পদ।

দেশের অর্থনৈতিক সাফল্য তরুণ প্রজন্মের আকাঙ্ক্ষা পূরণে ব্যর্থ হয়। ২০২৩ সালে দেখা যায় ১৫-২৯ বছর বয়সি ৪০ শতাংশ মানুষ কোনো চাকরি করছে না বা তাদের লেখাপড়া করছে না বা তারা কোনো প্রশিক্ষণও নিচ্ছে না। এদের এনইইটি (NEET) বলে অভিহিত করা হয়ে থাকে। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গ্র্যাজুয়েশন করে বের হওয়া তরুণদের মধ্যে বেকারত্বের হার তাদের চেয়ে কম লেখাপড়া করা গ্রুপের চেয়ে অনেক বেশি।

মূল্যস্ফীতিও বেড়ে প্রায় ১০ শতাংশে পৌঁছে যায়। ফলে জীবনযাপনের ব্যয় বাড়তে তাকে। এক বছরে সরকার বিদ্যুৎ ও গ্যাসের দাম তিনদফা বাড়ালে জ্বালানি ব্যয়ও অনেকটাই বেড়ে যায়।

কোটাব্যবস্থার বিরুদ্ধে আন্দোলনের কারণ অনেক গভীর। এই ক্ষোভ সবচেয়ে বেশি ছিল হতাশ ও রাজনৈতিকভাবে প্রান্তিক যুবকদের মধ্যে। তাদের দাবি খুব স্পষ্ট; তারা নিরপেক্ষ নির্বাচন, জবাবদিহিমূলক সরকার ও গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রবর্তন চায়।

গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় প্রত্যাবর্তন

১৯৭১ সালে পাকিস্তানের কাছ থেকে স্বাধীনতা পাওয়ার পর থেকে কখনোই বাংলাদেশে গণতন্ত্রের চর্চা হয়নি। দেশটি দুর্নীতি, বাক ও গণমাধ্যমের স্বাধীনতাহীনতা এবং বিরোধী দলকে নিস্পেষণের মধ্যেই এত বছর কাটিয়ে এসেছে। এর মধ্যে আরও রয়েছে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত গ্রেফতার, গুম ও বিচারবহির্ভূত হত্যা।

অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন হয় না বললেই চলে। গত জানুয়ারিতে এক বিতর্কিত নির্বাচনের মধ্যে দিয়ে চতুর্থবারের মতো ক্ষমতাসীন হন শেখ হাসিনা। ওই নির্বাচন বিরোধী দলগুলো বয়কট করে। বিরোধী দলের নেতাদের অনেকেই তখন ছিলেন কারাবন্দি। তবে সাম্প্রতিক বিক্ষোভ দেশে গণতন্ত্র ফেরানোর আশা তৈরি করেছে।

তরুণরা তাদের স্পৃহা, উদ্যম, প্রতিরোধ দক্ষতা ও একতার মধ্যে দিয়ে হাসিনার পতন নিশ্চিত করেছে। এরা প্রযুক্তিগতভাবেও অত্যন্ত দক্ষ। সরকার যখন মোবাইল ফোনে ইন্টারনেট সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেয়, তখনও তারা দেশ ও দেশের বাইরে থেকে তাদের আন্দোলনের গতিকে বেগবান রাখে।

যাহোক, এখন বাংলাদেশে সত্যিকারের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য প্রথমেই প্রয়োজন একটি প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ নির্বাচন এবং সরকার পরিচালনার একটি নতুন ব্যবস্থা। সেনাবাহিনী সব দলের অংশগ্রহণে একটি অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। তবে এর মধ্যে তরুণ ছাত্রনেতাদের কী করে সমন্বয় করা হবে, তা এখনও স্পষ্ট নয়।

উচ্চশিক্ষিত ও গণতন্ত্রের প্রতি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হওয়া সত্ত্বেও বাংলাদেশের তরুণরা ঐতিহ্য, উত্তরাধিকার ও রাজনৈতিক কাঠামোর কারণে পিছিয়ে পড়ে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, ২০২২ সালের পার্লামেন্টে তিরিশের কম বয়সি তরুণদের উপস্থিতি ছিল মাত্র ০.২৯ শতাংশ। আর চল্লিশের কম বয়সি এমপি ছিলেন মাত্র ৫.৭১ শতাংশ।

বর্তমানে যে রাজনৈতিক শূন্যতা তৈরি হয়েছে, তা দেশের তরুণদের রাজনৈতিকভাবে ক্ষমতায়নের জন্য একটি ইতিবাচক সুযোগ তৈরি করে দিয়েছে। যে অর্থনৈতিক ও সামাজিক কারণে বিক্ষোভ শুরু হয়, তা মূলত

তরুণদের ইস্যু। যথাযথ রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্ব ও অংশগ্রহণ সম্ভব না হলে আবারও তরুণদের কোণঠাসা হওয়ার ঝুঁকি তৈরি হবে, যা রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় অবিশ্বাসের জন্ম দেবে এবং সম্ভাব্য গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার উত্থানকেও ধসিয়ে দেবে।

সামনের পথ অত্যন্ত চ্যালেঞ্জিং। তবে বাংলাদেশের তরুণরা তাদের অধিকার ও ভবিষ্যতের জন্য লড়াই করার মানসিকতা ও প্রস্তুতির প্রদর্শন এরই মধ্যে দেখিয়ে ফেলেছে।

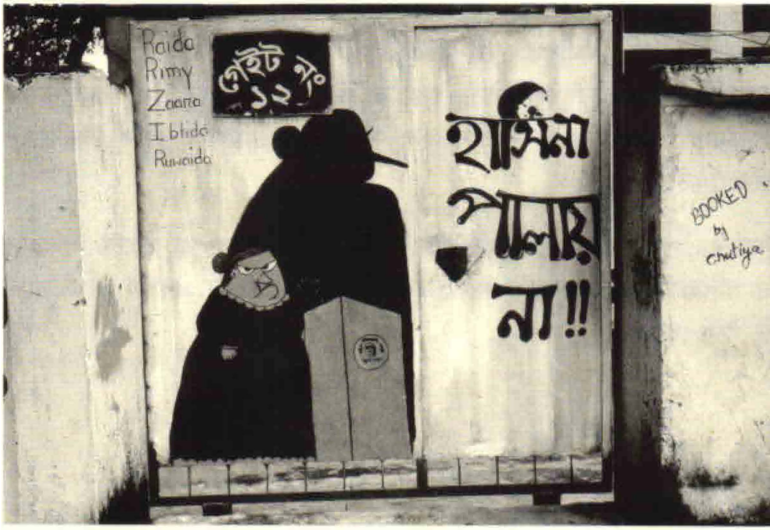
Raida
Rimy
Zaara
Ibtida
Rumaida
গেইট নং ১২
হাসিনা পালায় না!!
BOOKED by chutiya

স্বাধীনতা এনেছি
সংস্কারও আনবো

বাংলাদেশের স্বৈরশাসকের পলায়ন : ক্ষমতার শীর্ষে ভয়ংকর শূন্যতা

The Economist

(*দি ইকোনমিস্ট*-এ গত ৫ আগস্ট, ২০২৪ *বাংলাদেশ'স ডিক্টেটর ফ্লিস—লিভিং বাহাইন্ড অ্যা ড্যাঞ্জারাস ভ্যাকিউম* শিরোনামে এই প্রতিবেদন ছাপা হয়।)

---

৫ আগস্ট বিকেলে বাংলাদেশের টেলিভিশনগুলো শেখ হাসিনার বাসভবন থেকে একটি হেলিকপ্টার উড়ার চিত্র দেখায়। এ ঘটনার কয়েক মিনিট আগেও তিনি দেশের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। ওই হেলিকপ্টার তাকে ও তার বোনকে নিরাপদ স্থানে নিয়ে যাচ্ছিল। এর কিছুক্ষণের মধ্যেই উচ্ছ্বসিত বিক্ষোভকারীরা প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনে ঢুকে পড়ে। তার বেডরুমেও দেখা যায় বিক্ষোভকারীদের। তার পোষা প্রাণী ও ভবনের আসবাব হস্তগত করতে শুরু করে দেয়। জাতির উদ্দেশে দেওয়া এক ভাষণে সেনাপ্রধান জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামান নিশ্চিত করেন যে, শেখ হাসিনা পদত্যাগ করেছেন। তিনি একটি অন্তর্বর্তী সরকার গঠনের কথাও জানান। বিশ্বের অন্যতম স্বীকৃত স্বৈরাচার এবং সবচেয়ে বেশিদিন শাসনকারী নারী গণরোষে ক্ষমতা ছাড়তে বাধ্য হন। বিক্ষোভকারীরা বলেন—'হাসিনা একজন রক্তচোষা নেত্রী। আমাদের জন্য, তরুণদের জন্য তিনি রাক্ষস ছাড়া আর কিছু নন। তিনি বাংলাদেশকে ধ্বংস করে ফেলেছেন।'

১৭ কোটি মানুষের এই দেশকে গত ২৮ বছরের মধ্যে ২০ বছরই অত্যন্ত কঠোর হাতে শাসন করেছেন শেখ হাসিনা। এই দীর্ঘমেয়াদি রাজনৈতিক ক্ষমতার প্রধান কারণ সেনাবাহিনীর সমর্থন এবং কঠোর নিপীড়ন। গত জানুয়ারিতে অনুষ্ঠিত নির্বাচনের মধ্যে দিয়ে তিনি ৫ম বারের মতো ক্ষমতায় আসেন। ওই নির্বাচনে বিরোধী কোনো দল অংশ নেয়নি। এক দলীয় ওই নির্বাচনে হাসিনার দল আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে ব্যাপক অনিয়মের অভিযোগ ওঠে। তিনি নারী হয়েও দুর্দান্ত রাজনীতি করেছেন এবং তার সময়ে অর্থনৈতিক

অগ্রগতিও চোখে পড়ার মতো। কোভিড-নাইন্টিনের আগে দেশে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ছিল বছরে ৭ শতাংশ। আর এর মূল চালিকাশক্তি ছিল তৈরি পোশাক খাত। বাংলাদেশের লৌহমানবী ভারতের সহায়তায় তার শাসনকে সংহত করে তোলেন। চীনের সঙ্গেও তার ভালো সম্পর্ক ছিল। বাংলাদেশের প্রধান অস্ত্র সরবরাহকারী চীন। তবে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা পদদলিত করায় তার ব্যাপারে পশ্চিমাদের খুব একটা আগ্রহ ছিল না।

গত মাসের আগ পর্যন্ত ধারণা করা হচ্ছিল, ক্ষমতা ধরে রাখার ব্যাপারে শেখ হাসিনার পদ্ধতি কাজ করছে। এরপর শিক্ষার্থীদের নেতৃত্বে বিক্ষোভ শুরু হলো। এই বিক্ষোভের প্রাথমিক দাবি ছিল, কোটাব্যবস্থার সংস্কার। সরকারি চাকরিতে কোটাব্যবস্থায় ১৯৭১ সালের স্বাধীনতাযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী ও তাদের স্বজনদের জন্য ৩০ শতাংশ বরাদ্দ রাখা হয়। বিক্ষোভকারীদের দাবি আওয়ামী লীগের সমর্থকদের সুবিধা দেওয়ার জন্যই এ ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। বিক্ষোভ দমনে কঠোর অবস্থান নেয় সরকার। পুলিশ ও সেনাবাহিনীর অভিযানে অন্তত ২০০ মানুষ নিহত (বেসরকারি হিসাবে আরও বেশি) হয়। কারাগারে পাঠানো হয় ১০ হাজারের বেশি তরুণ-জনতাকে। সব স্কুল ও বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করে দেওয়া হয়। ৩ ও ৪ আগস্ট সরকারের এই তীব্র প্রতিক্রিয়ায় ক্ষুব্ধ হয়ে আরও বেশিসংখ্যক ছাত্র-জনতা রাস্তায় নেমে আসে। এবার তাদের দাবি প্রধানমন্ত্রীর পদত্যাগের। সরকারপন্থি সংগঠন ও পুলিশের হামলায় নিহতের সংখ্যাও বাড়তে থাকে। সরকার দেশজুড়ে কারফিউ জারি করে। একই সঙ্গে ব্রডব্যান্ড ও মোবাইল ফোনের ডেটা সেবা বন্ধ করে দেওয়া হয়।

৫ আগস্ট লাখ লাখ বিক্ষোভকারী ঢাকায় প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনের দিকে যাত্রা শুরু করে। প্রাথমিক অবস্থায় পুলিশ ও সেনাবাহিনী কাঁদানে গ্যাস, রাবার বুলেট ও তাজা গুলি ব্যবহার করে এই পদযাত্রা থামানোর চেষ্টা করে। তবে একপর্যায়ে তারা সরে দাঁড়াতে বাধ্য হয়। জনতাকে প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনে ঢোকার সুযোগ করে দেয়। এর মধ্যেই শেখ হাসিনা বুঝতে পারেন, তার সময় শেষ হয়ে এসেছে। হেলিকপ্টারে করে তিনি ভারতের উদ্দেশে রওনা দেন (এর পরের গন্তব্য সম্ভবত লন্ডন)। এখন হয়তো বেশ কিছুদিন সেনাবাহিনীর শাসন দেখা যাবে। শেখ হাসিনার পালানোর পর জাতির উদ্দেশে দেওয়া এক ভাষণে সেনাপ্রধান ওয়াকার-উজ-জামান প্রতিশ্রুতি দেন, বিরোধী ও সুশীল সমাজের সদস্যদের নিয়ে একটি অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠন করা হবে।

এখন তিনটি প্রশ্ন খুব বড়ো করে দেখা দিয়েছে। প্রথমটি হলো সড়ক ও অর্থনীতিতে কি নৈরাজ্য বাড়বে। চরমভাবে দ্বিধাবিভক্ত সমাজে প্রতিহিংসামূলক সহিংসতা বাড়বে কি না, তা নিয়েও সংশয় আছে। শেখ হাসিনার সমর্থক, ছাত্রবিক্ষোভকারী এবং বিরোধী দলের মধ্যে সম্পর্ক মোটেই সুবিধাজনক নয়। ৫ আগস্ট সন্ধ্যার মধ্যেই ঢাকাসহ সারা দেশে আওয়ামী লীগের অফিসগুলোতে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। দেশের অর্থনীতিতে তরুণদের বেকারত্ব একটি বড়ো সংকট হিসেবে বিবেচিত হচ্ছিল। মোট তরুণ জনগোষ্ঠীর দুই-পঞ্চমাংশ বেকার। দেশের এলিট শ্রেণি প্রচুর অর্থ দেশের বাইরে পাচার করে দেওয়ায় ব্যালেন্স অব পেমেন্ট নিয়েও বড়ো ধরনের সংকট তৈরি হয়। ২০২১ সালের পর থেকে দেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের পরিমাণ অর্ধেক কমে ১৯ বিলিয়ন ডলারে দাঁড়ায়। তত্ত্বাবধায়ক সরকার ও সেনাপ্রশাসনও বিষয়টি নিয়ে বড়ো ধরনের সংকটের মুখে পড়বে।

দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে, সামরিক শাসনের পর একটি বিশ্বাসযোগ্য গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা পুনর্নির্মাণ করা প্রসঙ্গে। এমন একটি ব্যবস্থা প্রবর্তনের ব্যাপারে তরুণ বিক্ষোভকারীদের আগ্রহ আছে। এক বিক্ষোভকারী বলছিলেন—'১৪ দিন আগে আমি এই বিক্ষোভে যোগ দিয়েছি। আজ ১৫তম দিন। আমি বিজয় দেখেছি। এই বাংলাদেশ জেন-জি গড়ে তুলেছে। আমি মার্শাল ল চাই না। আমি এমন একটি সংবিধান চাই, যেখানে মানুষের মূল্যায়ন করা হবে।'

সাবেক প্রধানমন্ত্রীর দীর্ঘ শাসন দেশ থেকে বিরোধী দলকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়। আদালত থেকে শুরু করে নির্বাচন কমিশন—সব প্রতিষ্ঠানকে অকার্যকর করে ফেলা হয়।

প্রধান বিরোধী দল বাংলাদেশ ন্যাশনালিস্ট পার্টির (বিএনপি) বহু নেতাকে কারান্তরিন করা হয়। তাদের মুক্তি দেওয়া হলে হয়তো বিএনপির পুনর্গঠন সম্ভব হতে পারে। তবে এই দলটিরও আওয়ামী লীগের মতোই বহু ধরনের সমস্যা রয়েছে। পরিবারতন্ত্র, অনুগতদের তোষণ ও ক্ষমতায় থাকার সময় নিপীড়নের অভিযোগ তাদের বিরুদ্ধেও রয়েছে। বাংলাদেশের এখন নতুন দলের প্রয়োজন। এর আগে উল্লেখযোগ্য আন্দোলনটি গড়ে উঠেছিল ২০০৭ সালে। ওই সময় নোবেলবিজয়ী অর্থনীতিবিদ ড. মুহাম্মদ ইউনূস একটি রাজনৈতিক দল গঠনের চেষ্টা চালিয়ে ব্যর্থ হন।

আর সব শেষ প্রশ্নটি হচ্ছে, দেশের বাইরে থেকে বাংলাদেশকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করা হবে কি না। এত বছর ভারত, চীন ও পশ্চিমা দেশগুলোর মধ্যে অনেকটা ঝুলন্ত অবস্থায় ছিল বাংলাদেশ। তবে ভারতের ব্যাপারেই হাসিনা সরকারের আগ্রহ বেশি ছিল। এবার হয়তো ভারতের প্রভাব কিছুটা কমবে। যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপও অনেক সময় শেখ হাসিনার শাসনের ব্যাপারে চোখ বন্ধ করে রেখেছিল। অবশ্য তৈরি পোশাক খাতের ব্যাপারে বাংলাদেশের ওপর তাদের একটা চাপ সবসময়ই ছিল। তবে শেষ পর্যন্ত শেখ হাসিনার পর বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ অনেকটাই নির্ভর করছে দেশটি জনগণের ওপর। জেনারেল ওয়াকার তাদের ধৈর্য ধরার পরামর্শ দিয়েছেন। নতুন অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠনের ব্যবস্থাপনায় তিনি রয়েছেন। তবে জনগণের ধৈর্য খুব বেশি সময় নিয়ে পরীক্ষা করতে চাইলে তিনি ভুল করবেন।

সেনা ও গণ-অভ্যুত্থানের চাপে
বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পদত্যাগ

TIME

(*টাইম ম্যাগাজিন* ৫ আগস্ট, ২০২৪ *বাংলাদেশ প্রাইম মিনিস্টার শেখ হাসিনা রিজাইনস আন্ডার প্রেসার ফ্রম মিলিটারি অ্যান্ড ম্যাস আপরাইজিং* শিরোনামে চার্লি ক্যাম্পবেলের লেখা এই প্রতিবেদন ছাপা হয়।)

বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গত সোমবার পদত্যাগ করেছেন। সরকারবিরোধী বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে পুলিশের ব্যাপক সংঘর্ষের পর সেনাবাহিনীর চাপে এ সিদ্ধান্ত নিলেন তিনি। গত কয়েক সপ্তাহে পুলিশ-জনতা সংঘর্ষে অন্তত ৩০০ জন নিহত হয়েছে। এর মধ্যে শুধু রবিবারই নিহত হয়েছে ৯০ জনের বেশি।

বাংলাদেশের সেনাপ্রধান ওয়াকার-উজ-জামান বিকেল চারটায় জাতির উদ্দেশে দেওয়া ভাষণে হাসিনার পদত্যাগের বিষয়টি জানানোর আগেই খবর ছড়িয়ে পড়ে। রাস্তায় রাস্তায় উৎসব শুরু হয়ে যায়। গাড়ির হর্ন বাজিয়ে, পতাকা নেড়ে মানুষ উৎসব উদ্‌যাপন করতে থাকে।

ওই ভাষণে ওয়াকার-উজ-জামান বলেন—'প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পদত্যাগ করেছেন। একটি অন্তর্বর্তী সরকার দেশ পরিচালনা করবে।' তিনি বলেন, কারফিউ বা রাষ্ট্রীয় জরুরি অবস্থার কোনো প্রয়োজন নেই। তিনি বিক্ষোভকারীদের ঘরে ফিরে যাওয়ার আহ্বান জানান।

হাসিনা পালিয়ে গেছেন—এমন উড়ো খবরের মধ্যেই রাস্তা থেকে ব্যারিকেড সরিয়ে নিয়ে ইন্টারনেট পরিষেবা চালু করা হয়। রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে আলোচনা ও মধ্যস্থতার চেষ্টার কারণে ওয়াকার-উজ-জামানের ঘোষণাও বারবার বিলম্বিত হচ্ছিল। এর মধ্যেই বিক্ষোভকারীরা ঢাকায় প্রধানমন্ত্রীর সরকারি বাসভবন গণভবনে ঢুকে পড়ে।

সরকারি চাকরিতে কোটাপ্রথা বিলুপ্তির দাবিতে গত মাসে শান্তিপূর্ণভাবে এই বিক্ষোভ শুরু হয়। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের স্বজনদের জন্য একটা বড়ো অংশ বরাদ্দ রাখা হয় সরকারি চাকরিতে। এর প্রতিবাদে বিক্ষোভে নামে ১৭ কোটি মানুষের দেশের ছাত্ররা। লাখো বিক্ষোভকারী গত রবিবার রাজপথে আন্দোলনে নেমে আসে। গত সোমবার মার্চ টু ঢাকার আয়োজন করা হয়। সেখানে অংশ নেয় কোটি মানুষ। এই আন্দোলন সহিংস হয়ে ওঠার কারণে সেনাবাহিনীকে মোতায়েন করা হয়।

একেবারে শেষ পর্যন্ত ৭৬ বছর বয়সি হাসিনা ক্ষমতা না ছাড়ার ব্যাপারে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন। শেষ পর্যন্ত সেনা-হস্তক্ষেপে তিনি পদত্যাগের সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হন। নিরাপত্তা বাহিনীর প্রধানদের সঙ্গে আলাপকালে তিনি বলেন— 'বিক্ষোভকারীরা ছাত্র নয় সন্ত্রাসী। এরা দেশকে অস্থিতিশীল করতে চাইছে।' কিন্তু জনরোষে তার দলের অবস্থাও অত্যন্ত অস্থিতিশীল হয়ে পড়ে। গত জানুয়ারিতে এক বিতর্কিত নির্বাচনের মধ্যে দিয়ে চতুর্থবারের মতো ক্ষমতায় আসে দলটি। এই নির্বাচনে বিরোধী দলের অংশগ্রহণ ছিল না। পর্যবেক্ষকদের মতে নির্বাচনটি অবাধ ও নিরপেক্ষও হয়নি।

ইলিনয় স্টেট ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক ও বাংলাদেশি-আমেরিকান রাষ্ট্রবিজ্ঞানী আলী রীয়াজ বলেন—'জনগণের ওপর নৃশংস দমন প্রক্রিয়ার পর মানুষ নতুন নেতৃত্ব দেখতে চাচ্ছিল। বাংলাদেশের শিক্ষার্থীদের দীর্ঘ সক্রিয়তার কথা মাথায় রেখে বলা যায়, সেই নেতাদের উত্থান ঘটেছে।'

হাসিনার এই পতন অত্যন্ত নাটকীয়। প্রধান ভুল ছিল, শান্তিপূর্ণ একটি ছাত্র আন্দোলনকে দমনের জন্য আওয়ামী লীগের ছাত্রসংগঠন ছাত্রলীগকে মাঠে নামানো। নিরাপত্তা বাহিনীও ছাত্রদের সঙ্গে অত্যন্ত কঠোর আচরণ করে। টাইমকে কূটনৈতিক বিশ্বস্ত সূত্র জানিয়েছে, নিহতের সংখ্যা এক হাজার ছাড়িয়ে যেতে পারে। দেশজুড়ে কারফিউ এবং ইন্টারনেট ব্লকেড সাধারণ মানুষ ও ব্যবসায়ীদের ক্ষুব্ধ করে তোলে।

শক্তিপ্রয়োগ করে সাময়িক স্থিতিশীলতা অর্জনের পর পুলিশ বাড়ি বাড়ি গিয়ে ছাত্রনেতা এবং হাজারো বিরোধী দলীয় নেতাদের আটক করতে শুরু করে। মোবাইল ফোনে থাকা ফুটেজ পরীক্ষা করে এই তৎপরতা চালায় পুলিশ। ইউনিসেফ জনিয়েছে, এই অভিযানে অন্তত ৩২ জন শিশু নিহত হয়। বহু শিশু

তাদের বাড়ির ভেতরে থাকা অবস্থায় গুলিবিদ্ধ হয়েছে, যা মানুষকে আরও বেশি ক্ষুব্ধ করে। এর মধ্যেই শেখ হাসিনা ট্রেন স্টেশনে গিয়ে ক্ষয়ক্ষতির জন্য কান্নাকাটি করেন। ছাত্রদের দেশদ্রোহী ও বিশ্বাসঘাতক বলেও অভিহিত করেন।

হাসিনা বরাবরই সেনাবাহিনীর ওপর নির্ভর করে এসেছেন। সেনাবাহিনীর রাজনীতিতে হস্তক্ষেপের ইতিহাস থাকলেও সাম্প্রতিক বছরগুলোতে তারা শর্তহীনভাবে হাসিনাকে সমর্থন করে এসেছে। তবে রবিবার সেনাপ্রধান বলেন—'সেনাবাহিনী সবসময়ই জনগণের পাশে থেকেছে।' তার প্রভাবশালী পূর্বসূরি জেনারেল ইকবাল করিম ভূঁইয়া বিক্ষোভকারীদের হত্যার তীব্র নিন্দা জানিয়ে সৈন্যদের ব্যারাকে ফেরত আনার দাবি জানান।

এর আগেই অবশ্য বিক্ষোভ দমনে জাতিসংঘের লোগো আঁকা সাঁজোয়া যান ব্যবহারের জন্য সংস্থাটি তীব্র নিন্দা জানায়। বাংলাদেশকে জাতিসংঘের শান্তিরক্ষী মিশনে নিষিদ্ধ করারও দাবি ওঠে। গত রবিবার জাতিসংঘের মানবাধিকার-বিষয়ক প্রধান ভলকার তুর্ক বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেন, শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভকারীদের ওপর হামলা বন্ধ করুন। ইন্টারনেট সংযোগ চালু করে অর্থবহ সংলাপের পরিবেশ সৃষ্টি করুন।

আলী রীয়াজ বলেন—'জেনারেলরা সম্ভবত দমন-পীড়নের মুখে আন্দোলনের পরিস্থিতি মূল্যায়ন করছিলেন এবং শেখ হাসিনাকে কী করে নিরাপদে দেশ ছাড়ার ব্যবস্থা করে দেওয়া যায় সেই পথটিও খুঁজে দেখছিলেন। তবুও হাসিনার পতন কেবল প্রথম পদক্ষেপ। কোনো সন্দেহ নেই যে, পরবর্তী পদক্ষেপগুলো অত্যন্ত কঠিন হবে। কার্যত প্রতিটি সরকারি প্রতিষ্ঠানই আওয়ামী লীগের রাজনীতি দ্বারা অতিমাত্রায় নিয়ন্ত্রিত।'

নরওয়ের ইউনিভার্সিটি অব অসলোর বাংলাদেশি শিক্ষাবিদ মুবাশ্বির হাসান বলেন—'ক্ষমতাসীন দল, কর্মী, পুলিশ ও জনগণের মধ্যে আস্থার তীব্র ঘাটতি রয়েছে। যথাযথ পদক্ষেপ নেওয়া সম্ভব না হলে দেশটি ভয়াবহ পরিস্থিতির দিকে চলে যেতে পারে।'

*****

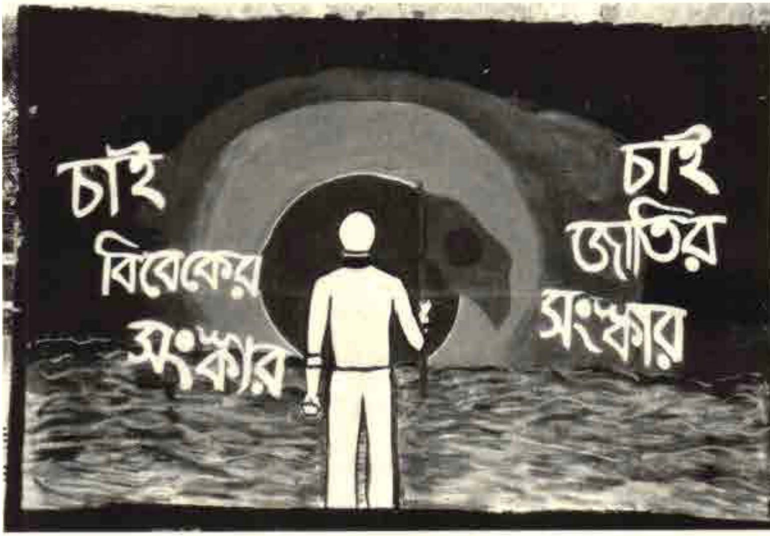
চাই
বিবেকের
সংস্কার
চাই
জাতির
সংস্কার

সালাম
নতুন
বাংলাদেশ

শেখ হাসিনার দেড় দশকের স্বৈরাচারী শাসনের অবসান ঘটেছে একটি সফল গণ-অভ্যুত্থানের মাধ্যমে। বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে সবচেয়ে রক্তাক্ত এই অভ্যুত্থানে মারা গেছে দেড় হাজারের বেশি নাগরিক। আহতের সংখ্যা বিশ হাজার ছাড়িয়েছে।

হাসিনা সরকারের ব্যাপক গণবিরোধী কর্মকাণ্ড জনমনে যে বিক্ষোভের আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছিল, তার প্রতিফলন ঘটেছে জুলাইয়ের ছাত্র-জনতার আন্দোলনে। ছাত্র-জনতার বাঁধভাঙা জোয়ারে ভেসে যায় শেখ হাসিনার সরকার। দ্রুত ক্ষমতা ছেড়ে তিনি ভারতে পালিয়ে যান। শেষ পর্যন্ত অবসান ঘটে শেখ হাসিনার দীর্ঘদিনের স্বৈরশাসনের।

সরকারি চাকরির কোটাবিরোধী আন্দোলন যখন শেখ হাসিনা সরকার নির্মমভাবে দমনের চেষ্টা করেন, তখন থেকে এই আন্দোলন আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমের নজরে আসে। নিউইয়র্ক টাইমস, আল জাজিরা, বিবিসি ও সিএনএন নিয়মিত এই আন্দোলনের খবর প্রচার শুরু করে। তবে ছত্রিশ দিনের আন্দোলনে দেড় দশকের নিষ্ঠুর একটি সরকারের পতনে ঘটবে, তা ছিল অবিশ্বাস্য। ফলে শেখ হাসিনার পতনের দিন থেকে আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে নানা ধরনের বিশ্লেষণ প্রকাশ হতে থাকে। বিদেশি গণমাধ্যমে প্রকাশ হওয়া এসব প্রতিবেদনে শেখ হাসিনার পতন ও পলায়নের আগের ও পরের নানা ঘটনা উঠে আসে। সেখানে শেখ হাসিনার দেড় দশকের শাসনের একটি চিত্রও অঙ্কিত হয়, যার ঐতিহাসিক গুরুত্ব অপরিসীম।

আলফাজ আনাম। জন্ম : গাইবান্ধা, ১৯৭৪ সাল। আড়াই দশক ধরে দৈনিক পত্রিকার রিপোর্টার ও সম্পাদকীয় বিভাগে কাজ করেছেন। বর্তমানে দৈনিক আমার দেশ পত্রিকায় সহযোগী সম্পাদক ও হেড অব এডিটোরিয়ালের দায়িত্ব পালন করছেন।

প্রচ্ছদ
প্রকাশন